KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ [illegible], কল-৩৬
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible]
Title : চড়ুই	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫০/১১ ৫০/১২	Year of Publication : ফাল্গুন ১৩৯৬ // March 1990 চৈত্র ১৩৯৬ // April 1990
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৫০ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

"ব্যক্তিত্বের স্বরূপ" প্রবন্ধে মানুষের ব্যক্তিসত্তা এবং সামাজিক সত্তার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বাভাবিক ধারাটি চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারত উপমহাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত কবে থেকে? কোন্ ধরনের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে? এই দুষ্টক্ষতের নিরাময়ের উপায়ই বা কী? এই মুহূর্তে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এইসব জটিল প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন বাংলাদেশের মনীষী অধ্যাপক আহমদ শরীফ।

যুক্তিবাদী আধুনিক মুক্ত মন নিয়ে "মহাভারত" — তর্কসাপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করেছেন অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাক্তন বিচারপতি অমলকুমার রায়ের "গীতা কি ধর্মগ্রন্থ?" —এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা করেছেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা প্রসঙ্গে মনীষী বিনয়কুমার সরকারের চিন্তাভাবনা নিয়ে অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরীর তথ্যসমৃদ্ধ গভীর বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ।

"রবিবাসর"-এর সম্পাদক বর্ষীয়ান সাহিত্যিক সন্তোষকুমার দে লিখেছেন মার্কিন মুলুকের অভিজ্ঞতা।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের পত্রের জবাব দিয়েছেন—অশোক মিত্র।

উত্তরপ্রদেশের লোকনাট্য "নওটঙ্কি" নিয়ে কিরণশঙ্কর মৈত্রের প্রতিবেদন।

চতুরঙ্গ

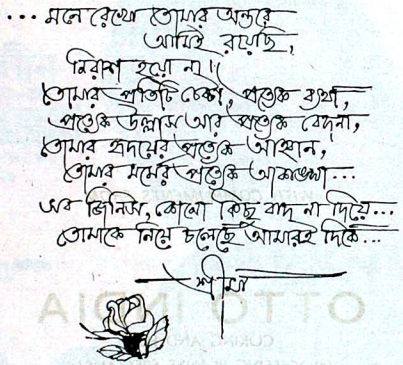

বর্ষ ৫০। সংখ্যা ১২
এপ্রিল ১৯৯০
চৈত্র ১৩৯৬

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৯৯৭
মহাভারতের সত্যজিজ্ঞাসা জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০৯
বিশিষ্ট সম্প্রদায়-চেতনার গোড়ার কথা আহমদ শরীফ ১০২৩
বিনয়কুমার সরকারের শিল্পদৃষ্টি সত্যজিৎ চৌধুরী ১০৩৬
মার্কিন মুলুকের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু কথা সন্তোষকুমার দে ১০৬০

ভাগলপুর ১৯৮৯ মধুষ দাশগুপ্ত ১০০৪
নিষেধাজ্ঞা সুরজিৎ দাশগুপ্ত ১০০৫
মহাযাত্রার দিকে নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার ১০০৬
মর্ত্যরসিক স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় ১০০৮

ড্রাগনের ঘর-গেরস্তি কামাল হোসেন ১০২৭

গ্রন্থসমালোচনা ১০৪৩
সুরজিৎ দাশগুপ্ত, রণেন্দ্রনাথ দেব, বসন্তকুমার সামন্ত, দিগম্বর দাশগুপ্ত

প্রতিবেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি ১০৫৭
উত্তরপ্রদেশের লোকনাট্য নওটাঙ্কি কিরণশঙ্কর মৈত্র

মতামত ১০৬৯
অশোক মিত্র, শেখ একরামুল হক

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ১২১-৬৩২১

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ত ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তি-নাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষের অবস্থান যখন একক পর্যায়ে তখন তার পরিচয় ব্যক্তিরূপে। লক্ষণীয় যে প্রাণিজগতে মানুষ ছাড়া আর কেউ-ই ব্যক্তিরূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এর দ্বারা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মনুষ্যত্বের এক অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে। অবশ্য মানুষ ব্যক্তি বলেই সে ব্যক্তিত্বের অধিকারী—এই অতিসরলীকরণ অর্থহীন ও অবাস্তব। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানুষের যে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে, অর্থাৎ, জন্মলাভের পর কালক্রমে একজন মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনে যে স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার দ্বারা সূচিত হয় তার ব্যক্তিতা। এই ব্যক্তিতার মাধ্যমে রক্ষিত হয় আরও পাঁচজন থেকে একজন মানুষের ভিন্নতা। অন্যভাবে বলা যায় যে মানুষের ব্যক্তিতা জগৎসংসারে তার অস্তিত্বের সূচক এবং স্বভাবতই এর ব্যবহারিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। কিন্তু মরণশীল মানুষের জৈব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার ব্যক্তিতাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, অর্থাৎ, ব্যক্তিতা আবদ্ধ এক নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে।

মানুষের ব্যক্তিত্ব তার এই ব্যক্তিতা থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক জিনিস। প্রতিটি পরিণত মানুষেরই ব্যক্তিতা আছে এবং তা সহজেই শনাক্ত করা যায়, কিন্তু সব মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। ব্যক্তিতার মতো ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বতস্ফূর্ত নয়। ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়েই পূর্ণ বিকাশ ঘটে মনুষ্যত্বের এবং এই ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হয় যত্নশীল প্রয়াসের মাধ্যমে। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত স্তরে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার যে সাধনা তারই পরম পরিণতি হল ব্যক্তিত্ব। স্বভাবতই এই ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা অনেক সময় ব্যক্তি-মানুষের জীবন-মরণের সীমানা অতিক্রম করে যায়। তাই দেখা যায় যে অসামান্য এক ব্যক্তিত্বের প্রভাব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনাবসানের পরেও অনুপ্রাণিত করে চলে শত-সহস্র ব্যক্তিকে। বস্তুত, যে মানুষ যথোপযুক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী, নিতান্ত মরণশীল হয়েও সে তার অমরত্বের চিহ্ন রেখে যায় তার ফেলে-যাওয়া সমাজ-সংসারে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে গেলে সর্বাগ্রে এর স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। অর্থাৎ, মানবজীবনে ব্যক্তিত্ব অর্জন যদি এক কাম্য, সচেতন প্রক্রিয়া হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে এই প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হবে কিসের ভিত্তিতে।

দুই

জীবজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী এই কারণে যে তার সত্তার মধ্যে নিহিত আছে

এমন কিছু সম্ভাবনা যা মনুষ্যেতর অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। উদ্যোগ এবং অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে এই সম্ভাবনা যখন সম্পূর্ণরূপে পল্লবিত হয়ে ওঠে, তখনই মানুষ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্বে। কিন্তু এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক সচেতনতা না থাকলে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই এই সম্ভাবনার বিকাশে তৎপর হওয়া সম্ভব নয়। অতএব আত্ম-সচেতনতাই হল ব্যক্তিত্ব অর্জনের প্রাথমিক শর্ত। অন্যভাবে বলা যায় যে, মানুষ আত্মসচেতন প্রাণী বলেই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হওয়ার যোগ্যতা এবং অধিকার একমাত্র তারই। কিন্তু পরিপার্শ্ব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিছক আত্মমগ্ন একাগ্রতার মধ্য দিয়ে এই আত্মসচেতনতা লাভ করা যায় না। কারণ নানা স্তরে, নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাযুজ্যে পরিপুষ্ট হয় ব্যক্তির জৈব অস্তিত্ব এবং জীবনচর্যা। অর্থাৎ, একক মানুষ ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত হলেও কোনো ব্যক্তিই বহির্জগতের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে একাকী জীবনযাপন করতে পারে না। স্বভাবতই, মানুষের আত্মসচেতনতার জাগরণ ঘটে এই বহির্জগতের সঙ্গে নিরন্তর মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

এই মিথস্ক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল মানুষের জ্ঞানজগৎ। জন্মলাভের পর থেকে জড় এবং জীব-জগতের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের পালা শুরু হয়। যতই এই পরিচয়ের মাত্রা গাঢ় এবং স্থির হয়, ততই বিস্তৃতি লাভ করে মানুষের জ্ঞানের পরিধি। কাজেই অস্বীকার করা যায় না যে, বহির্জগতের অস্তিত্বের কারণেই এই জ্ঞানের সঞ্চার। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাতায়ন দিয়ে বহির্জগৎ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এসে জড়ো হচ্ছে মানুষের কাছে। বহির্জগৎ আছে বলেই এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির জন্ম। এই অর্থে মানুষ স্পষ্টতই বহির্জগতের অধীন। তথাপি জ্ঞানপ্রক্রিয়াতে মানুষের স্বাতন্ত্র্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ তার মননের সক্রিয়তায় খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলিকে সুসংগঠিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারে বলেই সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আবার এই জ্ঞান মানুষের স্মৃতির আধারে রক্ষিত হয় বলেই তা তাৎক্ষণিকতার সীমারেখা অতিক্রম করে স্থায়িত্ব লাভ করে। অতএব জ্ঞানক্রিয়ায় মানুষের ভূমিকা শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় গ্রহীতার নয়, সে জ্ঞানের স্রষ্টাও; কারণ, জ্ঞানোৎপাদনে তার মননের সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর যা-কিছু আমাদের কাছে বাস্তব বলে স্বীকৃত তা মানুষের জ্ঞানগোচর বলেই বাস্তবের মর্যাদা পায়, অর্থাৎ, বস্তুজগতের যাবতীয় উপাদানের সত্যতা মানুষের জ্ঞানের আলোকেই উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। কাজেই বিশাল বস্তুজগতের মাঝখানে মানুষের জৈব অস্তিত্ব নিতান্ত সামান্য বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সে যে ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ নয়—এ কথা সে উপলব্ধি করতে পারে তখন, যখন সে নিজের মননশক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়। এই সচেতনতাই জ্ঞানজগতে মানুষকে আত্মসচেতন প্রাণী-রূপে প্রতিষ্ঠা দেয়। অন্যদিকে এইভাবে জ্ঞানক্রিয়ার প্রেক্ষিতে যে আত্মসচেতনতা দেখা দেয় তা মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটায়। বস্তুত, মানুষ আত্ম-সচেতন প্রাণী বলেই প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে সে নিত্য ধাবমান এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সভ্যতার উষালগ্ন থেকে প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামে রত হয়ে নিত্য-নতুন সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনের গৌরবময় বৃত্তান্ত সে রেখে চলেছে মানবেতিহাসের পাতায়-পাতায়।

জ্ঞানজগতে আত্মসচেতন প্রাণী-রূপে মানুষের যে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, একজন মানুষের নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত, ব্যক্তিজীবনে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মূল ভিত্তি হল এই আত্মসচেতনতা। ব্যক্তিগত স্তরে মানুষ যদি সতত মনে না রাখে যে জগৎসংসারে মানুষ হিসাবে তার

শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম অভিজ্ঞান হল তার মননশক্তি, এবং এই মননই হল সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের মূল অস্ত্র, তাহলে যেসব সম্ভাবনা তার মানবসত্তায় নিহিত আছে বিকাশের অপেক্ষায়, সেগুলি ধীরে-ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তির জৈব অস্তিত্ব অবশ্যই অক্ষুণ্ন থাকে এবং তা ব্যক্ত হয় তার ব্যক্তিতার মাধ্যমে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব অর্জনের সমস্ত ক্ষমতা এবং যোগ্যতাই তার অন্তর্হিত হয়। সে তখন নিছক ক্ষমতাশালী এক প্রাণী, কিন্তু অশেষগুণসম্পন্ন, সম্ভাবনাময় এক মানুষ নয়। অতএব ব্যক্তিত্বের স্বরূপ কী—এই প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর হল এই যে, নিজের মননের অস্তিত্ব ও শক্তি সম্পর্কে চেতনার জাগরণে একজন মানুষের মধ্যে যে আত্মসচেতনতা বা আত্মোপলব্ধি দেখা দেয়, তাই হল তার ব্যক্তিত্বের প্রধান উৎস।

তবে ব্যক্তিত্বের বিকাশে আত্মসচেতনতা বা আত্মোপলব্ধিই যথেষ্ট নয়, এই সচেতনতার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া দরকার সক্রিয় উদ্যোগ। অর্থাৎ, নিজের মননশক্তি সম্পর্কে সচেতন হলেই মানুষ আপনা-আপনি ব্যক্তিত্বশালী হয়ে ওঠে না। এই শক্তির সুষ্ঠু এবং সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগের মাধ্যমে সে যখন মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ রূপায়ণে তৎপর, একমাত্র তখনই সে তার বিভাসিত ব্যক্তিত্বের মহিমায় ধন্য হয়ে ওঠে। এর অর্থ এই যে ব্যক্তিত্বের বিকাশে আত্মসচেতন মানুষের আচরণগত ক্ষেত্রের নানা দিকেও গুরুদায়িত্ব আছে। এই কারণেই ব্যক্তিত্বের স্বরূপ অন্বেষণে মানুষের জ্ঞানজগতের পাশাপাশি তার আচরণের জগতেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

আচরণের ক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংযম সম্পর্কিত সতর্কতা। মননশক্তি মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই শক্তি যেমন প্রয়োগ করা যায় সৃষ্টিশীল এবং কল্যাণকর কর্মোদ্যোগে, তেমনই এর অপব্যবহারের পরিণামে দেখা দেয় বিধ্বংসী অমঙ্গল। যে আততায়ী নিখুঁত পরিকল্পনায় এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে, সে অবশ্যই প্রমাণ রাখে তার প্রখর মননশক্তির; যদিও এক্ষেত্রে তার উন্নত মননশক্তি অপপ্রয়োগের ফলে কলঙ্কিত হয়। কাজেই, ব্যক্তিস্তরে মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের মিলনঘটাতে হলে মননশক্তিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রেখে তাকে সুনীতি, শৃঙ্খলা আর সৎ আদর্শের অনুগামী করে তুলতে হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, আত্মসচেতন মানুষ যখন তার বিপুল সম্ভাবনাময় মননশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে কঠোর, যুক্তিনিষ্ঠ বিচারবোধের দ্বারা, যখন তার জাগ্রত আত্মশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় নৈতিক চেতনা, তখন তার ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে ইতিবাচক এবং অর্থময়।

এই বিচারবোধ বা নৈতিক চেতনার জাগরণের জন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে অবিরাম সংকল্প আর প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু যে স্থির প্রত্যয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ব্যক্তির এই বিচার-বোধ, ব্যক্তির অন্তর্লোক সে প্রত্যয়ের জন্মভূমি নয়, তার নিয়ন্তা সংশ্লিষ্ট সমাজের অনুশাসন। একটি নির্দিষ্ট সমাজ তার অন্তরভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য, তাদের জীবনে শান্তি, সুখ ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভালো আর মন্দ, ন্যায় আর অন্যায় সম্পর্কে কিছু সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করে দেয়। যেসব উপাদানের সাযুজ্যে এই সূত্রগুলি নির্মিত হয়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধর্মীয় বিধান, সামাজিক প্রথা আর লোকাচার, জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং অবশ্যই রাষ্ট্রীয় আইন। এইভাবে নানা ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে সমাজনীতির যে কাঠামো তৈরি হয়, তারই প্রভাবে ব্যক্তিস্তরে মানুষের বিচার-বোধ আর নীতিচেতনা গড়ে ওঠে। অতএব, ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্য মানুষের যেমন আত্মসচেতন হওয়া দরকার, তেমনই তার পক্ষে সমাজসচেতন হওয়াও আবশ্যিক।

অবশ্য এই সমাজসচেতনতার অর্থ সামাজিক

নিয়ম আর অনুশাসনের প্রতি নিঃশর্ত তথা নির্বিচার আনুগত্য নয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপাদন-উপকরণের অবাধ মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় বিত্তশালী শ্রেণীর সামাজিক প্রভুত্ব। এই প্রভুত্বের চারিপাশে সুরক্ষার অটুট প্রাচীর গড়ে তোলার স্বার্থে সমাজে নিরন্তর অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে জন-সাধারণকে প্রভাবিত করা হয় ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কিত এক সুনির্দিষ্ট নৈতিক ধারণায়, যার লক্ষ্য স্পষ্টতই জনস্বার্থ নয়—শ্রেণীস্বার্থ। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সামাজিক নীতির কাছে ব্যক্তি যদি বিনা প্রশ্নে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে ক্ষুণ্ন হয় তার বিচারবোধের স্বকীয়তা এবং ব্যক্তিত্বের অবদানে সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধনের সম্ভাবনা অবরুদ্ধ হয়। কাজেই এক্ষেত্রে আত্মসচেতনতাই হবে সমাজসচেতনতার যথার্থ পথপ্রদর্শক। অর্থাৎ, যে বিচারবোধের সহায়তায় মানুষ তার মননশক্তির সুপ্রয়োগের মাধ্যমে সবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে, সেই বিচার-বোধের উন্মেষে সামাজিক পরিবেশের অবদান যেমন অনস্বীকার্য, তেমনই এই বিচারবোধের আয়ুধে সজ্জিত হয়েই ব্যক্তি সমাজের কলুষনাশে উদ্যোগী হয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে সমাজের অবয়বে। অন্যভাবে বলা যায় যে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা যেমন সমাজনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া নয় তেমনই নির্ভীক, সচেতন ও আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অবদানেই সুনিশ্চিত হয় সমাজের প্রগতি ও পরিবর্তন।

তিন

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিমানুষ ব্যক্তিত্বের আধার হলেও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির মিথস্ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই আত্মসচেতন মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। আবার ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয় সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক কর্মধারায় তার যোগদানের মধ্য দিয়ে। এই বিচারেও বলা যায় যে, সমাজই হল ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের উপযুক্ত পটভূমি। এ ছাড়া ব্যক্তি নিজে তার ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও এই ব্যক্তিত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয় অন্যের স্বীকৃতিতে। অতএব, যেভাবেই দেখা হোক না কেন, ব্যক্তিত্বের সমাজবন্ধন কোনো-ক্ষেত্রেই অস্বীকার করা যায় না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা অবশ্য একথা মানতে চান নি। যেমন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিলের বিশ্বাস ছিল এই যে, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত পরিবেশেই ব্যক্তি তার নিজস্ব বৌদ্ধিক আর নৈতিক শক্তির সাযুজ্যে আত্মোন্নতি অর্জন করে উত্তরিত হতে পারে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতায়। কিন্তু ব্যক্তির উন্নত বৌদ্ধিক আর নৈতিক শক্তি তার একক প্রয়াসের ফল নয়, তার মধ্যে এই শক্তি সঞ্চারিত হয় বাইরের নানা উপাদান আর উৎসের নিরন্তর প্রেরণায়। মানবজীবনের এই সরল সত্যকে অস্বীকার করলে প্রকৃতপক্ষে এক মৌল প্রাকৃতিক নিয়মকেই উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু মিলের দর্শনে এই উপেক্ষার প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তার কারণ সম্ভবত এই যে, ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের ক্রমবর্ধমান জটিলাবর্ত লক্ষ করে তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে, ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তবে মিলের এই আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আধুনিক সমাজে। বস্তুত, আধুনিক কালে একদিকে যতই সামাজিক জটিলতা বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে ততই এই জটিলতার মোকাবিলায় ব্যক্তিত্বের নিত্য-নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে চলেছে। কাজেই, সংশ্লিষ্ট সামাজিক পটভূমিকে অস্বীকার করে ব্যক্তিত্বের স্বরূপসন্ধানের চেষ্টা করলে তা নিঃসন্দেহে হবে এক নিষ্ফল প্রয়াস। ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে যত সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, এবং এই সম্ভাবনা সম্পর্কে তার সচেতনতা যতই প্রখর হোক না কেন, এর সঙ্গে যদি বিশুদ্ধ সমাজ-

মনস্কতা যুক্ত না হয় তাহলে অনিবার্যভাবেই ব্যক্তিত্বের অকালমৃত্যু ঘটে।

এই সমাজমনস্কতার জন্ম হয় সেই লগ্নে, যখন মানুষ তার আত্মসচেতনতার সঙ্গে সেতুবন্ধন ঘটাতে পারে সমাজসচেতনতার। অর্থাৎ, ব্যক্তি যথার্থরূপে সমাজমনস্ক তখন, যখন আত্মসচেতন হয়েও সে তার ব্যক্তিতার সংকীর্ণ পরিমণ্ডল অতিক্রম করে সামুহিকতাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয় আর নিজেকে এবং নিজের জীবনকে বৃহত্তর সমাজজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ভাবতে শেখে। এই ভাবনার ছোঁয়ায় মানুষের অন্তরলোকে জ্বলে ওঠে মনুষ্যত্বের আলো, যার দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব এবং এই ব্যক্তিত্বের শক্তিরই পরিচয় বহন করছে মানবসভ্যতার এযাবৎ ইতিহাস।

চার

আত্মসচেতনতা এবং সমাজমনস্কতা যদি ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, ব্যক্তি এই দুই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে কী উপায়ে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিজের মননের অসামান্য শক্তি সম্পর্কে অটুট প্রত্যয়ই মানুষকে চিহ্নিত করে আত্ম-সচেতন প্রাণী-রূপে। কিন্তু ব্যক্তিস্তরে মননশীল হয়ে ওঠার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ এবং অধ্যবসায় না থাকলে এই প্রত্যয় অপরিণত থেকে যায়। অর্থাৎ, বিশুদ্ধ মননচর্চার মধ্য দিয়েই জাগ্রত হয় মানুষের আত্মচেতনা এবং যথার্থ শিক্ষাই হল এই মননচর্চার সর্বোত্তম প্রেরণা। তবে মননচর্চার ক্ষেত্র তৈরি হয় শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আর পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের দ্বারা—এই প্রচলিত ধারণা ঠিক নয়। সমগ্র জগৎ-সংসারই ব্যক্তির শিক্ষানিকেতন। প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে, প্রাত্যহিক জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, সামাজিক সম্পর্কের নানা জটিলতার মধ্য দিয়ে তার সামনে অহরহ এসে জড়ো হচ্ছে শিক্ষার অজস্র উপাদান। যে আগ্রহী আর উৎসুক, সে এখান থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা আহরণ করে শাণিত করতে পারে তার মনন-শীলতাকে। এই মননশীলতা যতই প্রখর আর সক্রিয় হয়ে ওঠে, মানুষ ততই জীবজগতে তার অনন্যতা উপলব্ধি করতে পারে; সে অনুভব করতে পারে যে মননশক্তিই তার সর্ববিধ শক্তি আর শ্রেষ্ঠত্বের উৎস এবং এই উপলব্ধি আর অনুভবের পথ ধরেই সে পৌঁছে যায় পরিণত আত্মসচেতনতার স্তরে।

এই আত্মসচেতনতা নিঃসন্দেহে এক ধরনের অহংবোধ। কিন্তু এই অহংবোধ মানুষ হিসাবে—ব্যক্তি হিসাবে নয়। অর্থাৎ, ব্যক্তির আত্মসচেতনতা তার ব্যক্তিতার অহংকার নয়, তা শুধু মানুষ হিসাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব আর অনন্যতা সম্পর্কিত তার চেতনা ও গর্বানুভূতি। মানুষ যদি তার ব্যক্তিগত সারল্য আর কৃতিত্বের ভিত্তিতে অহংবোধকে প্রশ্রয় দেয়, তাহলে তার উৎকট ব্যক্তিতার অশুভ প্রভাবে বিঘ্নিত হয় তার সমাজমনস্কতা, এবং এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিতাই হয়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রবল অন্তরায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, ব্যক্তিমানুষ যখন সামাজিক মানুষ হিসাবে তার অঙ্গীকার মেনে নেয় স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে, তখনই তার ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশ হয়। তবে প্রশ্ন ওঠে যে, ব্যক্তিমানুষ সামাজিক মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার সাধনায় মগ্ন হবে কোন্ প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে এবং কীসের আশায়, অর্থাৎ, মানুষের পক্ষে তার ব্যক্তিস্বার্থের সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে আত্মনিয়োগ করার সঠিক উপায় কী? ধর্মীয় অথবা আধিবিদ্যক বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় সহজে, এবং কোনো-কোনো দার্শনিক এইভাবেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, বলা হয়েছে যে পরার্থপরতাই হল ঈশ্বরসেবার প্রকৃষ্ট মাধ্যম, অতএব ব্যক্তিমানুষের সামাজিক মানুষে উত্তরণ

ঈশ্বরানুগতিরই পরিচায়ক। আবার কোনো-কোনো দার্শনিক আধিবিদ্যক পূর্বানুমান আশ্রয় করে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি ব্যক্তির মানবসত্তা দেশ আর কালের অতীত অতীন্দ্রিয় এক অনন্তসত্তার অংশীদার; এই বিবেচনায় প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের অন্তরভুক্ত অন্য সকলের সঙ্গে নিজের সত্তার অভিন্নতা মেনে নিতে হয় এবং এইভাবেই ব্যক্তিস্বার্থ সমন্বিত হয় সমাজস্বার্থের সঙ্গে। কিন্তু প্রমাণ-নিরপেক্ষ এবং নিছক বিশ্বাসনির্ভর হওয়ার জন্য এইসব যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। বস্তুত, ব্যক্তি আর সমাজ যেহেতু দুই বাস্তব সত্য, সে কারণে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের যে-কোনো সূত্রই নির্ধারিত হওয়া উচিত বাস্তব বিচারে।

আপাত-অসম্ভব বলে মনে হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে আত্মসচেতন হলে তাকে অনিবার্যভাবেই সমাজমনস্ক হতে হয়, অর্থাৎ আত্ম-সচেতনতাই হল সমাজমনস্কতার উৎস। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে আত্মসচেতন ব্যক্তির সচেতনতা তার ব্যক্তিতা সম্পর্কে নয়, এই সচেতনতা প্রকৃতপক্ষে তার মনুষ্যত্ব সম্পর্কে—যার উপর কোনো বিশেষ ব্যক্তির একক মালিকানা নেই, যা সমগ্র মানবজাতিরই এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কাজেই, ব্যক্তি যখন তার মনুষ্যত্ব সম্পর্কে সচেতন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে স্বীকার করে নিতে হয় যে সে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর এক অংশ-মাত্র, অর্থাৎ, এক অর্থে অপরের সঙ্গে সে যে অভিন্ন—এই চেতনায় সে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এইভাবেই আত্মসচেতনতার গর্ভে জন্ম নেয় সমাজমনস্কতা। আবার মনুষ্যত্বের মূল উপাদান হল মননশক্তি। কাজেই, ব্যক্তি যখন তার মনুষ্যত্ব সম্পর্কে সচেতন, তখন প্রকৃতপক্ষে সে মানুষ হিসাবে নিজের মননশক্তি সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু এই সচেতনতার যথার্থ প্রমাণ তার প্রয়োগে। অর্থাৎ, ব্যক্তি যদি তার মননশক্তি প্রয়োগে সম্পূর্ণ বিরত থাকে তাহলে সে তার মনন-শক্তি সম্পর্কে সচেতন—এ কথা আদৌ প্রমাণিত হয় না। মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তির বহির্লোকের মতো তার অন্তর্লোকও এই মননশক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র। যে মুহূর্তে ব্যক্তি তার নিজের উপর ফেলে এই মননের সন্ধানী আলো, সেই মুহূর্তে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার নিজের সীমাবদ্ধতা, সে উপলব্ধি করে যে সমগ্র মানবশক্তির অংশভাক্ হিসাবে সে এক পরম গৌরবের অধিকারী হলেও, ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজের প্রতিটি উদ্যোগকে সফল করার জন্য অন্যের কোনো না কোনো সাহায্য আর সহযোগিতার উপর নির্ভর করা ছাড়া তার উপায়ান্তর নেই; অর্থাৎ, সমাজকে অস্বীকার করে ব্যক্তির পক্ষে তার বস্তুগত জীবনধারা সচল রাখা আদৌ সম্ভব নয়। অতএব নিতান্ত বাস্তব কারণেই আত্মসচেতনতা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে অকৃত্রিম সমাজমনস্কতায়। কাজেই ব্যক্তিমানুষকে সামাজিক মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার প্রেরণা দিতে কোনো ধর্মীয় বা আধিবিদ্যক বিশ্বাসলব্ধ পূর্বানুমানের প্রয়োজন নেই। ব্যক্তির আত্মসচেতনতাই তার সমাজমনস্কতার মৌল ভিত্তি, এবং এই আত্মসচেতনতার জাগরণ কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়া নয়। ব্যক্তিমানুষ যখন তার অন্তঃস্থ মননের শক্তি সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন, এবং এই শক্তিপ্রয়োগে সতত কঠোরভাবে বিচারশীল, তখন সে একই সঙ্গে আত্মসচেতন ও সমাজমনস্ক।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে, ব্যক্তিত্বের স্বরূপ প্রতিভাত হয় মানুষের মননক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। মানুষ যখন তার মননসম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং এই সম্পদের সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের ও সমাজের উন্নয়ন- ও কল্যাণ-সাধনে তৎপর, তখনই তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তবে মনে রাখতে হবে যে, মননশক্তির জাগরণ এবং তার যথোপযুক্ত ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হলে ব্যক্তিস্তরে মানুষকে অনেক মূল্য দিতে হয়। ক্ষুদ্র স্বার্থের সীমানা পার হয়ে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হয় বৃহত্তর সামাজিক

স্বার্থকে, আবেগের হাতছানি উপেক্ষা করে তাকে যুক্তি আর বিচারবোধের আধিপত্য মেনে নিতে হয়, এবং খণ্ড ব্যক্তিতাকে নিরন্তর শাসনে রাখতে হয় অখণ্ড মনুষ্যত্বের আদর্শের দ্বারা। এক কথায়, বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব অর্জনের সাধনা প্রকৃতপক্ষে মহৎ মনুষ্যত্ব লাভের সাধনা।

ব্যক্তির মধ্যে এই মনুষ্যত্ব যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন তার ব্যক্তিত্ব প্রতিনিধিত্ব করে সমগ্র মানব-সমাজের। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে ব্যক্তিমানুষ উত্তরিত হয় বিশ্বমানবের পর্যায়ে। এই বিশ্বমানবে রূপান্তরিত হওয়াই ব্যক্তিত্বের সাধনার পরম লক্ষ্য। যে মানুষ এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছে তার ব্যক্তিতার আবরণ থেকে, নিজের আর সংশ্লিষ্ট জাতীয় সমাজের যাবতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে সে অখণ্ড মানবস্বার্থকে নিজের স্বার্থ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ব-লোককে সে বরণ করে নিয়েছে নিজের সংসাররূপে। এই পর্যায়ে ব্যক্তি পূর্ণ এবং মুক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সীমার মাঝখানে দাঁড়িয়েও সে অসীমতার অনুভবে ধন্য, এবং তার ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবন তখন ভাসমান মহাজীবনের আনন্দতরঙ্গে।

ভ্রম-সংশোধন

মার্চ ১৯৯০ সংখ্যায় মতামত বিভাগে প্রকাশিত অন্নদাশঙ্কর রায়ের চিঠিতে কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। পাঠকেরা অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নিয়ে বাধিত করবেন।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ পাঠ
৯৯০	২	১২	'লড়কে দিতে'।
৯৯০	২	১৯	বারোজ আসার আগে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ইটের পেয়েছে
৯৯১	১	১৪	একদল লীগপন্থী
৯৯১	২	১১	বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্যে আনীত সরকারি launch-এর অতিথি
৯৯২	১	১১	গুণ্ডাকে ধরো

ভাগলপুর ১৯৮৯

মঞ্জুম দাশগুপ্ত

রক্তগোলাপের কাছে গেলে
বিস্ময়ের চোখ বড়ো হয়
নিঃশব্দ ভাষায় চলে কিছুক্ষণ পাঠবিনিময় :

আমারো শরীরে রক্তে সেই একই রঙ
এবং তোমারো
তবু তার এত অপচয়
আমি জানি এখন অমৃতযোগ নয়…

পতিতপাবনী গঙ্গা নৃমুণ্ডমালিনী
এত লোভ
আমারই ভায়ের রক্তে রক্তবর্ণ হয়…

আমার শরীরে কোনো পাপড়ি নেই শুধুমাত্র কাঁটা
এখন ভারতবর্ষে ছিটকে পড়ে কণিষ্ক গোধূলি
চারদিকে হিমঠাণ্ডা বিপুল সন্নাটা :

গোলাপ বিদ্রূপ করে
স্তব্ধতার তির্যক উপমা…

নিষেধাজ্ঞা

সুরজিৎ ঘোষ

এ পাড়ায় জোরে হর্ন-বাজানো নিষেধ,
এখানে অন্ধদের পাঠশালা।
চিৎকার হৈ হল্লা গলির ক্রিকেট, এখানে এসব চলবে না,
তৈরি হচ্ছে বিরাট নার্সিংহোম।
এ পাড়ায় শিশুদের প্রবেশ নিষেধ
গর্ভপাত সম্পূর্ণ আইনসম্মত
আর শতদলের খেলার মাঠ জুড়ে বসবে
আলোঝলমল মনোহারী কমপ্লেক্স।

চতুর্দিকে নিয়ন সাইনের ঝকমকানির মধ্যে
খেলার বলগুলো দেখাই যাচ্ছে না।
বড়ো-বড়ো লাল অক্ষরে শুধু ফুটে উঠছে
নিষেধ! নিষেধ!

মহাযাত্রার দিকে

নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

বৃষ্টির তানপুরায় বেলোয়ারি সঙ্গত
চলছে মল্লারের।
কেঁপে-কেঁপে উঠছে সেই সঙ্গত
তার শারীরিক গোপনতায়।
সুর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে
হাওয়ার আঙুলে-আঙুলে।
ফুলের মতো থরে-থরে ফুটে উঠছে
শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে তার
সেই রোমাঞ্চ।
ঝিকিমিকি করে উঠছে লক্ষহীরার মঞ্জিল।
তার শরীর নর্তকী হয়ে উঠছে।
দেবদাসীর আরতির মতো হয়ে উঠছে
তার অঙ্গরাগ।
অপাঙ্গ দৃষ্টির রূপনির্ঝর
বৃষ্টির প্রপাত হয়ে উঠছে।
মানবীর শরীর হয়ে উঠছে বৃষ্টি।
তার শরীরের বৃষ্টির মধ্যে
আমি স্নান করে উঠলাম।
অজস্র বৃষ্টির মতো স্নান।
অন্তহীন আনন্দের মতো।
অনন্তের আকাশ থেকে
বৃষ্টি অনন্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে
পৃথিবীকে।
অশেষের নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে
সুখের মতো।
স্তম্ভিত সুরভির মতো।
হংসবলাকার উচ্ছ্বাস ঝরে-ঝরে পড়ছে
সে সুরভির মুগ্ধতায়।
বৃষ্টির অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছে
অজস্র যৌবন।
ঋষির মতো যৌবনের ভৃঙ্গারে

অনঙ্গের উল্লাস বিভূষিত হয়ে উঠছে।
অনন্তের রূপসজ্জায় সজ্জিত ধরিত্রী
অভিসারিকার মতো তাকিয়ে আছে
বৃষ্টির দিকে।
মহাযাত্রার দিকে বৃষ্টি এগিয়ে চলেছে
ভ্রূক্ষেপহীন পদক্ষেপে।

মর্ত্যরসিক

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

মিথ্যে হয়ে যায়—
নির্মল স্বচ্ছতোয়া নদী, বিহঙ্গ-কাকলী
গুঞ্জিত কান্তার ভ'রে পুষ্পের অনবদ্য সুন্দর,
অবসন্ন ফাল্গুনের শব্দহীন কুঞ্জবনে
মেলে না উত্তর।

মর্ত্যের অঙ্গনে—
হৃদয় এবার নিকটের দিন গোনে,
দুঃসাহসী মেঘের বহ্নি-স্পন্দনে
পরিশ্রান্ত মরুতে শ্যামল তারই ইঙ্গিত আনে।

ক্রমে উর্বর স্বভাবত তার তৃষ্ণাস্ফীত পলি,
ফোটাতে ক্ষুধার চিরকাঙ্ক্ষার শাওন-ধানের কলি!

অভিসার বাঁধে নীড় শ্রমময় খড়কুটো দিয়ে
মৃন্ময় অনুনয় হৃদয়ের কাছে—
নিষ্পাস্থ এ সরণীর নক্ষত্রের রাত আর নয়,

চলো যাই—
অসংখ্য পদপাতে আমার পায়ের চিহ্ন যেখানে মিলায়
সচেতন স্পর্শগুলি লেগে।

মহাভারতে সত্যজিজ্ঞাসা

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন মহাভারত প্রথম লেখা হয়েছিল, তখন স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ। রাজনীতির ক্ষেত্রে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ছিল তখন শাস্ত্রীয় অনুশাসনের মূল আধার। এই গ্রন্থ যদিও রচিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে, কৌটিল্য নিজেই বৃহস্পতিপ্রভৃতিপ্রাচীনতর অনেক শাস্ত্রকারের অনুশাসন এতে সংকলিত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষত্রিয়ধর্ম সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসন প্রায় আদি মৌখিক মহাভারতের মতোই প্রাচীন। এদিকে সামাজিক অনুশাসনের আধার মনুস্মৃতিও রচিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। এই ধর্মশাস্ত্রের মূল ঐতিহ্যও প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনতর ধর্মসূত্রগুলি থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ মহাভারতের কলেবর যে সময়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে সময়ে অর্থশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রও লিখিত হয়। আর এই দুই স্মৃতিশাস্ত্র একাধারে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন, এবং সমর্থনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং মহাভারত একই রাষ্ট্রীয় এবং আর্থসামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন এবং মূল্যবোধের আধার। তবে প্রাথমিক ক্ষত্রিয়কাহিনীতে অর্থশাস্ত্রের, আর পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে মনুস্মৃতির প্রভাব বেশি। লিখিত মনুস্মৃতি রচনা শেষ হবার পর আরও অন্তত দু-শ বছর ধরে মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং এ সময়ের সংযোজনে এই ধর্মশাস্ত্রের অনেক প্রত্যক্ষ উদ্‌ধৃতি পাওয়া যায়।[1] একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্ষত্রিয়ধর্ম সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র এবং মনুস্মৃতির মধ্যে কোনো মৌলিক মতদ্বৈধ নেই। প্রকৃতপক্ষে মনুস্মৃতির সপ্তম পরিচ্ছেদ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেরই সারসংগ্রহ-বিশেষ। কিন্তু পল্লবিত মহাভারতের কোন্ অংশ কোন্ সময়ে লেখা হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা বর্তমানে অসম্ভব। অতএব এই নিবন্ধে সমগ্র বেদব্যাসী মহাভারতে সত্যাদর্শের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাই নিয়েই আলোচনা করা হবে।

রামায়ণের মতো মহাভারতেও বাস্তবতা অর্থে

সত্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয় নি। দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পঞ্চপাণ্ডবের অলৌকিক জন্ম, দ্রোণ ও কর্ণের অসম্ভব উপায়ে জন্ম, কৃষ্ণের অলৌকিক সুদর্শন-চক্র, কৃষ্ণ-কর্তৃক বারবার বিশ্বরূপ প্রদর্শন এবং অন্যান্য মায়া ও কুহক সৃষ্টি, বহুসংখ্যক দিব্যাস্ত্রের আসাযাওয়া, দেবদেবীদের অবিরত গমনাগমন ও পুষ্পবৃষ্টি, সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি, অর্জুনের ইন্দ্রলোক অভিযান, একেকজন বড়ো যোদ্ধা দ্বারা বহু সহস্র সৈন্য নিধন, ব্রহ্মার রথে চড়ে যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গারোহণ প্রভৃতি অসংখ্য অবাস্তব এবং অসম্ভব, এতসব অসত্য ঘটনায় মহাভারত পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে এরকম অসংখ্য উপাখ্যান ও ঘটনাকে 'আষাঢ়ে গল্প' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। প্রাচীন মহাকাব্যে কল্পনাকে বল্গাহীন স্বাধীনতা দিয়ে সত্যনিষ্ঠার সাহিত্যিক ভিত্তি নির্মাণ করা স্বভাবতই দুরূহ। অতএব সত্যনিষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত চরিত্রগুলির মধ্যেই মহাভারতে সত্যের স্বরূপ সন্ধান করতে হবে।

কর্ণপর্বে মহাভারত-কাহিনীর নায়ক এবং বিষ্ণুর অবতার বলে কথিত স্বয়ং কৃষ্ণ অর্জুনকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি মিথ্যে কথা বলা সম্পূর্ণ ধর্মসম্মত। কৃষ্ণ বলেছেন: 'সাধু ব্যক্তিই সত্যকথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ···কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না।' তারপর কৃষ্ণ বলাক-নামক ব্যাধ কিভাবে বহুপ্রাণী-হত্যাকারী এক অন্ধ শ্বাপদকে বধ করে দেবতাদের প্রেরিত বিমানে স্বর্গে গিয়েছিলেন—সে কাহিনী বললেন। আর এই উপাখ্যানেও বললেন যে কৌশিক নামে এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণ দস্যুভয়ে বনে প্রবিষ্ট লোকেদের সন্ধান দস্যুদের বলে দিয়ে এই সত্যকথনের ফলে ঘোর নরকে পতিত হয়েছিলেন। ধর্মের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক আরও ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ বললেন: 'অনেকে শ্রুতিকে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের উৎপত্তি নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য করিলেই ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীদিগকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণী-দিগের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম। ···প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতিনিধন এবং উপহাস—এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্মতত্ত্বদর্শীরাও উহাতে অধর্ম নির্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সেস্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়। ···ধর্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত-নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।'[৩] সত্যাসত্য সম্বন্ধে একই তত্ত্ব শান্তিপর্বে ভীষ্ম এবং ভৃগুর মুখেও আরোপ করা হয়েছে।[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে কৃষ্ণের এই সত্যাসত্যব্যাখ্যাকে পাশ্চাত্য হিতবাদী দর্শনের সাহায্যে সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন। বহুর স্বার্থে একের কিংবা সংখ্যাল্পের বিনাশ ধর্মসম্মত, অতএব সে উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রয়োগও সত্যেরই সমতুল, এই হল বঙ্কিমী যুক্তির সারমর্ম।[৫] পাশ্চাত্য হিতবাদের বিভিন্ন গুরুতর ত্রুটি নিয়ে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই, কারণ কৃষ্ণ স্বয়ং হিতবাদী যুক্তি প্রয়োগ করেন নি। কৃষ্ণের ব্যাখ্যায় যেসব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তার বেশির ভাগই শুধুমাত্র ব্যক্তি-স্বার্থের পরিপূরক এবং বহুজনের পক্ষে ক্ষতিকর। বিবাহের সময় মিথ্যাভাষণ মানবিক মূল্যবোধে গুরুতর অপরাধ, এবং এর দ্বারা স্বার্থপ্রণোদিত নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও স্ত্রীর এবং অন্যান্য বহু লোকের সর্বনাশ হবার আশঙ্কা। রতিসম্ভোগের উদ্দেশ্যে মিথ্যাভাষণের

ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। নিজের প্রাণসংশয় অথবা সর্বনাশ উপস্থিত হলে মিথ্যা বলা উচিত কিনা—তা নিয়ে হয়তো বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু এ মিথ্যাও বহুজনের হিতের জন্যে নয়, নিজ স্বার্থ-রক্ষার জন্যেই। ব্রাহ্মণের উপকারের জন্যে মিথ্যা-ভাষণের পক্ষে তো কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না। আর অহিংসাই যদি সত্যধর্মের পরাকাষ্ঠা হয়, তবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ না করে পাণ্ডবেরা নিজ দাবি পরিত্যাগ করে কোনো উৎপাদনশীল কাজের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করলেই পারতেন। অথবা প্রত্যেক ভাই একেকটি গ্রামের মানুষকে শোষণ না করে যদি তাদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ নিতান্তই অসম্ভব হয়, তবে তাঁরা অহিংস পন্থায় প্রায়োপবেশনে দাবি আদায়ের চেষ্টা করতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, মহাত্মা গান্ধী সত্যাসত্যের কৃষ্ণব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা-ভাষণ অকর্তব্য, এই ছিল তাঁর মূল বক্তব্য। কৌশিকের উপাখ্যান নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলে-ছিলেন যে, এরকম অবস্থায় অসত্য কথা না বলে সত্য বলতে অস্বীকার করা এবং প্রয়োজন নিজের জীবন উৎসর্গ করাই বিধেয়।[৬] প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের মুখে সত্যের এরকম সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা আরোপ করে অর্থশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রে সমর্থিত রাষ্ট্র- ও সমাজ-ব্যবস্থাকেই সত্যনিষ্ঠ এবং চিরন্তন বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে।

দুই

মহাভারতের আদিপর্ব থেকেই একটার পর একটা ছলনা এবং মিথ্যা মানবিক মূল্যবোধকে আঘাত দেয়। দ্রোণাচার্য প্রকৃতপক্ষে একলব্যের গুরু ছিলেন না। তিনি একলব্যকে জাতের কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তথাপি ধনুর্ধর হিসেবে অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দাবি করলেন। বিদ্যার্থী কিশোরের প্রতি এর চেয়ে মিথ্যা, ছলনাময় এবং নৃশংস ব্যবহার অকল্পনীয়। তারপর জতুগৃহ-দাহের সময় ঘটল পঞ্চপাণ্ডবদের দ্বারা সংঘটিত আরেক বিরাট ছলনা এবং বীভৎসতা। এক দরিদ্র নিষাদ-জননী এবং তাঁর পঞ্চপুত্রকে নিমন্ত্রণ করে পাণ্ডবেরা তাঁদের সব উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। তারপর তাঁদের জতুগৃহের ভেতরে অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পাণ্ডবেরা সুরঙ্গপথে পালিয়ে গেলেন, যাতে অস্থি দেখে দুর্যোধন-সহ সকলে মনে করে যে পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তী আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। নিষাদজননী ও তাঁর পঞ্চপুত্রের প্রতি পাণ্ডবদের নিমন্ত্রণ মিথ্যা, তাঁদের পানভোজন ও আপ্যায়ন মিথ্যা। তাঁদের বীভৎস মৃত্যু পাণ্ডবদের দ্বারা নিজ স্বার্থে সরলপ্রাণ দরিদ্র মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা মাত্র। জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবেরা পালিয়ে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নেন, এবং সেখানে ভীম-কর্তৃক বকরাক্ষসবধ প্রসঙ্গে স্বয়ং কুন্তী একটা মিথ্যে কথা বলেন। যদিও কুন্তী জানতেন যে ভীম যুদ্ধ করেই বকাসুরকে বধ করবেন, তথাপি তিনি ব্রাহ্মণকে এই মিথ্যে কথা বললেন যে তাঁর পুত্র মন্ত্রসিদ্ধ, সে মন্ত্রপ্রভাবে রাক্ষসের কাছে খাবার পৌঁছে দিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে আসবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যেন সেকথা কাউকে না বলেন, কারণ তাহলে লোকেরা ভীমের কাছে মন্ত্র শিখতে আসবে। তারপর দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় পাণ্ডবেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেন এবং সে পরিচয়েই অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেন। লক্ষ্যভেদের পর কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও অর্জুন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেন, আর ব্রহ্মতেজ অজেয়—এই কথা মনে করেই কর্ণ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হন। পরে দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সহবাস-কালে ঘরে ঢুকে পড়ে অর্জুন পূর্বসত্য পালনের জন্যে বারো বৎসর বনবাসের প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু বনবাস বিশেষ করলেন না। প্রথমে গঙ্গাদ্বারে

গিয়ে উলূপীকে, তারপর মণিপুরে গিয়ে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন। তিন বৎসর চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে মণিপুরের রাজপ্রাসাদে বাস করার পর দ্বারকায় গিয়ে সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করলেন এবং এক বৎসর তাঁর সঙ্গে দ্বারকায় থাকলেন। তারপর বনবাসের শেষ অংশ পুষ্করতীর্থে কাটালেন।

সভাপর্বের ছুটি উল্লেখযোগ্য হত্যাকাণ্ডের ঘটনা যথাক্রমে কৃষ্ণের প্ররোচনায় এবং কৌশলে ভীম-কর্তৃক জরাসন্ধবধ, আর স্বয়ং কৃষ্ণ-কর্তৃক শিশুপালবধ। কৃষ্ণ, অর্জুন আর ভীম ব্রাহ্মণের বেশ ধরে পেছনের দরজা দিয়ে জরাসন্ধের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং তারপর নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। জরাসন্ধ তাঁদের এই ছলনার নিন্দা করলেও ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে সম্মত হন, এবং চোদ্দদিন যুদ্ধ চলার সময় কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জুনকে নিরাপদে অতিথি হিসেবে নিজপ্রাসাদে রাখেন। ক্ষাত্ররীতিতে ক্লান্ত এবং যুদ্ধবিমুখ যোদ্ধাকে বধ না করে সময় দেবার প্রথা ছিল। কিন্তু এরকম অবস্থাতেই কৃষ্ণের কুটিল ইঙ্গিতে ভীম জরাসন্ধকে বধ করেন। চলে আসবার সময় কৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্রের কাছ থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে আসেন। মহাভারতে কৃষ্ণ এই জরাসন্ধবধের তিনটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত, জরাসন্ধ তখন সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজা, অতএব তিনি জীবিত থাকতে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজসূয়যজ্ঞ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ক্ষাত্ররীতি অনুসারে উচিত ছিল সম্মুখযুদ্ধে যুধিষ্ঠির-কর্তৃক জরাসন্ধের পরাজয়, ছলনার মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করা নয়। কৃষ্ণের দ্বিতীয় যুক্তি, জরাসন্ধ ছিয়াশি জন পরাজিত রাজাকে বন্দী করে রেখেছিলেন, আর চোদ্দজন হলেই সবাইকে মহাদেবের উদ্দেশে বলি দিতেন। কিন্তু জরাসন্ধকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী রাজাদের মুক্তি দিলেই প্রচলিত ক্ষাত্ররীতি রক্ষিত হত। তথাপি মানবিক মূল্যবোধে এই যুক্তিকে হয়তো বা কিছুটা সমর্থন করা যেত, যদি না কৃষ্ণের তৃতীয় যুক্তিতে জরাসন্ধবধের প্রধান ও স্বার্থান্ধ কারণ প্রকাশ হয়ে পড়ত। কৃষ্ণ বললেন যে, জরাসন্ধের কাছে বারবার পরাজিত হয়ে তিনি এবং তাঁর জ্ঞাতিরা মথুরা থেকে পলায়ন করে দুর্ভেদ্য রৈবতক পর্বতের আড়ালে কুশস্থলী নগরীতে আশ্রয় নিয়েছেন, এবং সর্বদা মথুরায় ফিরে আসবার উপায় চিন্তা করছেন। কিন্তু তিনি এবং তাঁর জ্ঞাতিরা জানেন যে তিনশত বৎসর যুদ্ধ করেও তাঁরা জরাসন্ধকে পরাজিত করতে পারবেন না। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞকে উপলক্ষ করে এবং ভীম এবং অর্জুনের সহায়তায় মিথ্যা আর ছলনার সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন। তাঁর এই অপকৌশলও ব্যর্থ হত যদি জরাসন্ধ এই ছলনার উত্তরে প্রাসাদের মধ্যে মল্লযুদ্ধে সম্মত না হয়ে নিজ সৈন্যদের দ্বারা তিন অনুপ্রবেশকারীকে বধ করতেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষ্ণ প্রধানত নিজ স্বার্থ-প্রণোদিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ছলনা দ্বারা ভীমের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করলেন।

শিশুপালবধে কৃষ্ণের ব্যক্তিস্বার্থের প্রকাশ আরও প্রকট। যুধিষ্ঠির সম্ভবত এই কারণে কৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করে তাঁকে সম্রাট হতে সাহায্য করেছেন, আর তাই রাজসূয়যজ্ঞে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অতিথি হিসেবে অর্ঘ্যদান করেছিলেন। শিশুপালের একমাত্র দোষ যে কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, দ্রুপদ, দ্রোণ, ব্যাসদেব, ভীষ্ম, কৃপ, শল্য, কর্ণ ইত্যাদি যেখানে উপস্থিত, সেখানে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে যুধিষ্ঠির-কর্তৃক অর্ঘ্যদানের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। শিশুপাল একথাও বলেন যে কৃষ্ণ যেহেতু রাজাও নন, ব্রাহ্মণও নন, তাই অর্ঘ্য পাবার তাঁর কোনো অধিকার নেই। বিশেষত যে 'দুরাত্মা' কৃষ্ণ অন্যায় উপায়ে জরাসন্ধকে বধ করেছেন, তাঁকে অর্ঘ্য দিয়ে যুধিষ্ঠিরের ধর্মাত্মা পরিচয়ই নষ্ট হল। উপস্থিত রাজাদের মধ্যে অনেকেই শিশুপালকে সমর্থন করলেন। ফলে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হল। তখন কৃষ্ণ শিশুপালের অনেক কুকীর্তির কথা বললেন, যার মধ্যে এও ছিল

যে রুক্মিণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের পূর্বে শিশুপাল রুক্মিণীর পাণিপ্রার্থী ছিলেন। তারপর কৃষ্ণ খাণ্ডবদাহের সময় বরুণের কাছ থেকে পাওয়া সুদর্শনচক্র দ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদ করলেন। প্রকৃতপক্ষে শিশুপাল কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব চ্যালেনজ করার ফলে, এবং তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের পূর্বশত্রুতাবশতই কৃষ্ণ তাঁকে বধ করলেন। জরাসন্ধবধের বেলা বন্দী রাজাদের কথা স্মরণ করে হয়তো বা বহুজনের হিতকে আংশিক যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু শিশুপালবধের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো যুক্তিই নেই। ব্যক্তিগত কারণে কোনো প্রতিপক্ষকে বধ করাই কি ভগবানের অবতারের সত্য-নিষ্ঠা? পরবর্তী কালে দ্রোণপর্বে ঘোর যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতিকে তিনি অর্জুনের হিতার্থে আগেই বধ করেছিলেন। এঁরা জীবিত থাকলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষেই যোগ দিতেন। আর এঁরা সমস্ত দেবসেনা এবং সমগ্র পৃথিবীকে পরাজিত করতে সমর্থ ছিলেন।[৭] এই যদি জরাসন্ধ- আর শিশুপাল-বধের প্রকৃত কারণ হয়, তবে কি এদের বধের সময় কৃষ্ণ জ্ঞাতসারেই অন্য অনেক মিথ্যা যুক্তির অবতারণা করেছিলেন? আর পাণ্ডবদের হিতার্থে ভবিষ্যদ্রষ্টা কৃষ্ণ এরকম আরও নানা অদ্ভুতাত সৃষ্টি করে আগে থেকেই যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন এবং কর্ণকে তাঁর অলৌকিক সুদর্শনচক্র দ্বারা অথবা অন্য কোনো কৌশলে বধ করে ফেলতেন, তবে কুরুক্ষেত্রের সর্বনাশা ধ্বংসলীলার তো প্রয়োজনই হত না।

তিন

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ও পাণ্ডবেরা অনেক মিথ্যা এবং ছলনার আশ্রয় নেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায়। ভীষ্মকে পরাজিত করতে না পেরে এবং তাঁর পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মের কাছে গেলেন এবং তাঁর মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে তাঁর কাছ থেকেই তাঁর বধের উপায় জেনে নিলেন। তিনি স্ত্রীলোক কিংবা পূর্বে স্ত্রীলোক ছিলেন এমন কারও সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না জেনে কৃষ্ণের পরামর্শে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে শিখণ্ডী স্বয়ং এবং আড়াল থেকে অর্জুন শরাঘাতে ভীষ্মকে জর্জরিত করেন, এবং এভাবেই ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হন। দ্রোণকে পাণ্ডবেরা পরাজিত করতে ব্যর্থ হলে কৃষ্ণ বললেন: 'হে অর্জুন! ধনুর্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য সংগ্রামে শরাসন ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও উঁহাকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তোমরা ধর্মপরিত্যাগ-পূর্বক কৌশল করিয়া উঁহাকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করো। নচেৎ আচার্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন—ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোনো ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমনপূর্বক বলুন যে অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।'[৮] প্রথমে ভীম দ্রোণকে এই মিথ্যে কথা বললেন। কিন্তু দ্রোণ তাঁকে বিশ্বাস না করে সত্যবাদিতার জন্যে বিখ্যাত যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন। যুধিষ্ঠির ইতস্তত করছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন: 'আপনি মিথ্যা কথা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যা প্রয়োগ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে।'[৯] সকলেই জানেন, যুধিষ্ঠির তখন উচ্চকণ্ঠে 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই ঘোষণা করে পরে অস্ফুটস্বরে 'ইতি কুঞ্জরঃ' বললেন। এই মিথ্যে কথা বিশ্বাস করে পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধ অপরাজেয় দ্রোণাচার্য অস্ত্র ত্যাগ করে যোগস্থ হলেন। আর সেই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দ্রোণের শিরশ্ছেদ করলেন এবং তাঁর মুণ্ড তুলে নিয়ে কৌরবদের সামনে নিক্ষেপ করলেন। যুদ্ধের নিয়মবন্ধনের সময় স্থির হয়েছিল যে অস্ত্রহীন কিংবা যুদ্ধে বিমুখ কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করা হবে না। কিন্তু দ্রোণবধে সরাসরি মিথ্যাভাষণ ছাড়াও

এই নিয়ম ভঙ্গ করে সরাসরি মিথ্যাচারণ করা হল। প্ররোচক স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার, মিথ্যাভাষী স্বয়ং ধর্মপুত্র, আর মুণ্ডচ্ছেদকারী যজ্ঞোত্থিত ধৃষ্টদ্যুম্ন। জয়দ্রথের পরাক্রম সহ্য করতে পাণ্ডবেরা ব্যর্থ হলে কৃষ্ণ মায়া দ্বারা তমসা সৃষ্টি করে সূর্যকে আচ্ছন্ন করলেন। সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী অস্ত্রসংবরণ করে জয়দ্রথ আকাশের দিকে তাকালেন। আর সেই অবসরে অর্জুন জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ করলেন। তারপর কৃষ্ণ আবার মায়াবলে অন্ধকার সরিয়ে দিলেন। যুদ্ধের নিয়মবন্ধনে উভয় পক্ষই মেনে নিয়েছিলেন যে অপরের সঙ্গে যুদ্ধরত ব্যক্তিকে কোনো তৃতীয় পক্ষ অস্ত্রাঘাত করবে না। কিন্তু সাত্যকিকে পরাজিত করে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদনে উদ্যত ভূরিশ্রবাকে অর্জুন আক্রমণ করলেন এবং কৃষ্ণের উপদেশে ভূরিশ্রবার ডান হাত কেটে ফেললেন। ভূরিশ্রবা এই বলে অর্জুনকে তিরস্কার করলেন যে অপরের সঙ্গে যুদ্ধরত ব্যক্তিকে আক্রমণ করা অস্ত্রধর্মবিরুদ্ধ—একথা জেনেও তাঁর বাহুচ্ছেদন করে অর্জুন অত্যন্ত গর্হিত এবং নৃশংস কর্ম করলেন। 'এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্মের বিরুদ্ধাচরণপূর্বক সাত্যকির নিমিত্ত যে অন্যায় কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে কৃষ্ণেরই অভিপ্রেত। হে পার্থ! বাসুদেবের সহিত যাহার সখ্যভাব নাই, এমন কোনো ব্যক্তিই অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে অর্জুন! বৃষ্ণি ও সদ্ধকবংশীয়গণ ভ্রাত্য-ক্ষত্রিয় এবং স্বভাবতই নিন্দনীয়। তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া কার্যানুষ্ঠান করে। তুমি কিরূপে তাহাদিগের মতানুসারে কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও?'[১০] তারপর ভূরিশ্রবা অস্ত্রত্যাগ করে যোগস্থ হলেন, আর তখন সাত্যকি উঠে এসে আবার যুদ্ধের নিয়মভঙ্গ করে তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের আগেই পাণ্ডবদের হিতার্থে ইন্দ্র কর্ণের সহজাত অভেদ্য বর্ম কুণ্ডল দান হিসেবে চেয়ে নিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় কর্ণের কমজোর বিকল্প বর্ম ভেঙে যাবার পর অর্জুন যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে বর্মহীন অবস্থায় তাঁকে শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেন। তারপর কর্ণ যখন নিরস্ত্র অবস্থায় রথ থেকে নেমে মাটিতে-বসে-যাওয়া রথের চাকা তুলবার চেষ্টা করছিলেন, তখন অর্জুন কৃষ্ণের পরামর্শে আবার যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে শরাঘাতে তাঁকে বধ করলেন। তার আগেই অর্জুনবধের উদ্দেশ্যে কর্ণকর্তৃক রক্ষিত ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্র কৃষ্ণ ছলনার সাহায্যে ঘটোৎকচের ওপর প্রয়োগ করতে কর্ণকে বাধ্য করেন।

কর্ণবধের আগের একটি ঘটনায় কৃষ্ণ-কর্তৃক মিথ্যা এবং ছলনা সমর্থনের বড়ো প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্জুন তখনও কর্ণকে বধ করতে পারেন নি শুনে শিবিরে বিশ্রামরত যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে বললেন যে অর্জুনের উচিত গাণ্ডীবধনু অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া। এই কথা শুনে অর্জুন খড়্গহস্তে যুধিষ্ঠিরের দিকে অগ্রসর হলেন। কৃষ্ণ কারণ জিজ্ঞেস করলে অর্জুন বললেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কেউ যদি তাঁকে গাণ্ডীব অন্যকে দিয়ে দিতে বলেন তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে বধ করবেন। কৃষ্ণ এই ব্যাখ্যা দিলেন যে গুরুজনকে 'তুমি' সম্বোধন করলেই তাঁকে হত্যা করবার সমান হয়। অর্জুন তাই করলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে কিঞ্চিৎ নিন্দাও করলেন। তারপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এভাবে অপমান করবার অনুশোচনায় আত্মহত্যার শপথ করলেন। তখন কৃষ্ণ আবার এই ব্যাখ্যা দিলেন যে আত্মপ্রশংসাই আত্মহত্যার সমান। অর্জুন তখন নিজের প্রশংসা করলেন। আর এভাবেই কৃষ্ণের ব্যাখ্যায় তাঁর ছুটি প্রতিজ্ঞাই রক্ষা হল। কিন্তু কৃষ্ণ এ ধরনের সহজ বিকল্পের বিধান অন্য ক্ষেত্রে দেন নি। ভীম নিজ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্যে জীবিত দুঃশাসনের বক্ষভেদ করে বারবার তাঁর উষ্ণ রক্ত পান করে বললেন: 'মাতৃস্তন্য, ঘৃত, মধু, সুরা, সুবাসিত উৎকৃষ্ট জল, দধি, দুগ্ধ এবং উত্তম তক্র প্রভৃতি যেসকল অমৃতরসতুল্য সুস্বাদু পানীয় আছে, আজ এই শত্রুশোণিত তৎসর্বাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল।[১১]

এরকম একটা বীভৎস প্রতিজ্ঞাপালনের কোনো সহজ বিকল্প কৃষ্ণ দিলেন না কেন? ভীম এবং দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন: 'বৃকোদর অপেক্ষা কুরুরাজের যত্ন ও যুদ্ধনৈপুণ্য অধিক। অতএব ভীমসেন ন্যায়যুদ্ধে কদাচ দুর্যোধনকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অন্যায় যুদ্ধ করিলেই দুরাত্মা দুর্যোধন বিনষ্ট হইবে।...যদি ভীমসেন উহার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম সংকটে নিপতিত হইবেন।...অতএব যদি বৃকোদর উহাকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার না করেন, তাহা হইলে ঐ বীর নিশ্চয়ই আমাদের নির্জিত রাজ্য লাভ করিয়া ভূপতি হইবে।'[১২] সকলেই জানেন, তারপর অর্জুনের ইঙ্গিতে ভীম অন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। মনে হয় ভীম প্রতিজ্ঞার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ শুধু যে তা স্মরণ করিয়ে দিলেন তাই নয়, অন্য কোনো বিকল্প পন্থা না বলে সরাসরি অন্যায়যুদ্ধে উৎসাহ দিলেন।

মৃত্যুশয্যায় শয়ান দুর্যোধন কৃষ্ণকে ভীষ্মবধ, দ্রোণবধ, ভূরিশ্রবাবধ, এবং কৃষ্ণের নির্দেশে তাঁর নিজের উরুভঙ্গ প্রভৃতির উল্লেখ করে বললেন: 'হে কংসদাসতনয়!...তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র-সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন।...অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখো, যদি তোমরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য উপায়প্রভাবেই স্বধর্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।'[১৩] কৃষ্ণ এসব অভিযোগ স্বীকার করে পাণ্ডবদের বললেন যে কৌরব বীরগণ অসাধারণ সমরবিশারদ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন, এবং পাণ্ডবেরা কখনো তাঁদের ন্যায়যুদ্ধে পরাজিত করতে পারতেন না। 'আমি কেবল তোমাদের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশপূর্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না।'[১৪] ভীম-কর্তৃক অন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনবধে ক্রুদ্ধ বলরামকে কৃষ্ণ বুঝিয়ে বললেন যে এসব কাজ তিনি প্রকৃতপক্ষে নিজেদের স্বার্থেই করেছেন। শাস্ত্রোক্ত আট প্রকার নিজ উন্নতির উদ্ধৃতি দিয়ে কৃষ্ণ বললেন যে মিত্রের উন্নতিতে নিজের উন্নতি, আর মিত্রের অবনতিতে নিজেরও অবনতি। পাণ্ডবেরা বৃষ্ণিদের আত্মীয় এবং সহজমিত্র। অতএব পাণ্ডবদের উন্নতিতেই বৃষ্ণিদের উন্নতি। আর এই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ-কর্তৃক কপট নীতি প্রয়োগ শাস্ত্রসম্মত।[১৫] কৃষ্ণের ভাষা ও বক্তব্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরেও পাণ্ডবেরা আরেকটা গুরুতর অন্যায় করলেন। অর্ধেক রাজত্বের উপর তাঁদের প্রকৃতপক্ষে ন্যায়সংগত কোন দাবি ছিল কিনা, তা বিতর্কের বিষয়। যাই হোক, প্রধানত ধৃতরাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যে তাঁরা অর্ধেক রাজ্য পেয়েছিলেন, এবং এই অর্ধেকের দাবি নিয়েই তাঁরা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যুদ্ধের পরেও ধৃতরাষ্ট্র জীবিত এবং তিনিই হস্তিনাপুরের রাজা। কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে সমগ্র রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। এমনকী পুত্রদের শ্রাদ্ধ করবার জন্যে ধৃতরাষ্ট্রকে যুধিষ্ঠিরের কাছে অর্থভিক্ষা করতে হল। আর কৃষ্ণের উপদেশ পাবার পরই যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ অর্থ ধৃতরাষ্ট্রকে দিলেন। অগত্যা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয়কে নিয়ে বানপ্রস্থে চলে গেলেন। তারপর সেখানে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী মারা গেলেন। এভাবেই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে এবং যুদ্ধের পরে কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবেরা ন্যায় ও সত্যের জয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন। প্রকৃতপক্ষে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নির্দেশিত ক্ষত্রিয়দের স্বার্থান্বেষী রাজনীতিই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের আগে আর পরে মূল ক্ষত্রিয়কাহিনীতে প্রতিফলিত। এর মধ্যে সত্যাদর্শের চিহ্নমাত্রও খুঁজে

পাওয়া কঠিন। সত্যহীন, ন্যায়হীন, কুটিল রাজনীতির কৌশলই অর্থশাস্ত্রে এবং মহাভারতে প্রতিফলিত। আর কৃষ্ণ মহাভারতে এ ধরনের রাজনীতির আদর্শ প্রতীকী চরিত্র। পরবর্তী কালে মহাভারতের বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে পাণ্ডবদের সত্যাদর্শের প্রতিভূ এবং কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলে প্রচারের চেষ্টা মূল ক্ষত্রিয়কাহিনীকে মুছে দিতে পারে নি। কারণ ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের আগেই মূল কাহিনী বহুলপ্রচারিত এবং জনপ্রিয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল।

চার

মূল ক্ষত্রিয়কাহিনীর চারিদিকে মহাভারতে সমকালীন সামাজিক কাঠামোর যে বিন্যাস ফুটে উঠেছে তা প্রধানত মনুস্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সেখানে ক্ষত্রিয়ের নির্বিরোধ এবং ন্যায়নীতিহীন সার্বভৌমত্বের সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে শূদ্রের দাসত্ব, এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর পরাধীনতার চিত্র পরিস্ফুট। আদিপর্বের এক জায়গায় গন্ধর্বরাজ পাণ্ডবদের আক্রমণ করে বললেন যে পাণ্ডবেরা একজন ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী করে চলেন না বলেই তিনি তাঁদের আক্রমণ করলেন। ব্রাহ্মণের সাহায্য ছাড়া শুধু বীরত্বে রাজ্যজয় করা যায় না, আর ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে রাখলে চিরকাল রাজত্ব করা যায়। রাজসূয়যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণেরা আসামাত্র যুধিষ্ঠির তাঁদের শতসহস্র ধেনু, স্বর্ণ, শয্যা ও দাসী দান করলেন, আর স্বয়ং কৃষ্ণ 'শ্রেষ্ঠ ফল লাভের আশায়' তাঁদের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হলেন। বনপর্বের প্রথমেই যুধিষ্ঠির ঘোষণা করছেন যে তিনি ব্রাহ্মণের সেবার জন্যেই অর্থ কামনা করেন, নিজের জন্যে নয়। বনপর্বেই বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করছেন ব্রাহ্মণের দেবত্ব কী কারণে হয়, আর যুধিষ্ঠির সঠিক উত্তরে বলছেন, বেদাধ্যয়নের ফলে। শান্তিপর্বে চার্বাকবধ উপাখ্যানে স্বয়ং কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন যে ব্রাহ্মণগণ ভূতলস্থ দেবতা এবং সতত অর্চনীয়। অনুশাসনপর্বের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে, এবং কী কারণে ব্রাহ্মণ-সেবা রাজাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য, আর ব্রাহ্মণেরা সব মানুষের পূজনীয়, সে বিষয়ে ভীষ্ম বিস্তারিত উপদেশ দিয়েছেন। বনপর্বে মার্কণ্ডেয় ঋষি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে কলিযুগের শেষে ব্রাহ্মণ কল্কি অবতার আবির্ভূত হয়ে শূদ্র এবং ম্লেচ্ছদের 'ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ-দের হাতে পৃথিবীর শাসনভার অর্পণ করবেন, আর এভাবেই সত্যযুগের সূচনা হবে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের এই আপাতশ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে ক্ষত্রিয়দের অগ্রাধিকার এবং তাঁদের উপর ব্রাহ্মণদের নির্ভরতার লাঘব করে নি। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন লক্ষ্য-ভেদে উদ্যত হলে উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁকে এই বলে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন যে তাঁরা ক্ষত্রিয়দের বিদ্বেষভাজন হতে চান না। জ্ঞাতিবধ করে রাজ্যলাভের জন্য চার্বাক যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করলে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হয়ে চার্বাককে মেরে ফেললেন। শান্তিপর্বে ভীষ্ম রাজধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলেছেন : 'বেদে কথিত আছে যে অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম ও উপধর্ম সমস্তই রাজধর্মের আয়ত্ত। যেমন সমুদয় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদ-চিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্মই রাজধর্মে লীন হইয়াছে। ধর্মবেত্তা পণ্ডিতগণ অন্যান্য ধর্মকে অল্পফলপ্রদ এবং ক্ষত্রিয়ধর্মকে আশ্রমের সারভূত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।'[১৬] শান্তিপর্বেই, ইন্দ্রও বলেছেন যে 'অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'[১৭] দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও জীবিকার জন্যে কৌরবদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলে তাদের পক্ষেই যুদ্ধ করেছিলেন।

সামাজিক কাঠামোতে মহাভারতে ব্রাহ্মণদের বিপরীত মেরুতে অবস্থান শূদ্রদের। একলব্য শূদ্র ছিলেন বলেই দ্রোণাচার্য তাঁর উপর নৃশংস অত্যাচার করতে পেরেছিলেন। পঞ্চপুত্র-সহ নিষাদজননীকে জতুগৃহে পুড়িয়ে মারা পাণ্ডবদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, এবং তৎকালীন মূল্যবোধে নিন্দনীয় হয় নি, কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শূদ্রহত্যা কোনো অপরাধ বলে গণ্য হত না। অস্ত্রবিদ্যাপরীক্ষার সময় অর্জুন কর্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অস্বীকৃত হয়েছিলেন কর্ণের আপাত-শূদ্রত্বের কারণেই। স্বয়ংবরসভায় দ্রৌপদী চীৎকার করে কর্ণকে বরণ করতে অস্বীকার করেছিলেন একই কারণে। যদিও দ্রুপদ শুধু ধনুর্বিদ্যা ছাড়া জাতপাত কিংবা অন্য কোনো শর্ত আরোপ করেন নি। বকরাক্ষসবধ উপাখ্যানে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলছেন যে ব্রাহ্মণ রাক্ষসের হাতে নিহত হলে শূদ্রের বেদশ্রুতির ইচ্ছার মতো অপাত্রেরা তাঁর কন্যাকে কামনা করবে। শিশুপালবধের সময় কৃষ্ণ বলছেন যে শূদ্রের বেদশ্রুতির বাসনার ন্যায় মরণাভি-লাষী শিশুপালের একবার রুক্মিণীর পাণিগ্রহণের বাসনা হয়েছিল। অনুশাসনপর্বে চ্যবন-নহুষ উপা-খ্যানে ব্রাহ্মণ চ্যবন এবং ক্ষত্রিয় নহুষ পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করলেন, এবং ধীবরদের সমস্ত ন্যায্য প্রাপ্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করলেন। শূদ্রদের হীনস্থান নির্দিষ্ট করে শান্তিপর্বে ভীষ্ম বলেছেন : 'ভগবান প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তিন বর্ণের পরিচর্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম। ঐ ধর্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্রের পরম সুখলাভ হয়। শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব ভোগবিলাসে তাহার অর্থ সঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থ সঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে।... যদি প্রভুর ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে শূদ্র আপনার পরিবারবর্গের ভরণপোষণাতিরিক্ত ধন দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রের অর্থসঞ্চয় করিবার অধিকার নাই। তাহার যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে, প্রভু তাহা গ্রহণ করিবে।'[১৮] একমাত্র রাজার আদেশে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানের জন্য শূদ্রদের কিঞ্চিৎ ধনসঞ্চয়ের অধিকার কেন দেওয়া হয়েছে তা অতি স্পষ্ট। কারণ ধর্মকর্মে ব্যয়িত অর্থ সবই ব্রাহ্মণেরা পাবে। বনপর্বে মার্কণ্ডেয় বলেছেন যে, কলির সন্ধ্যায় অধর্ম যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছোবে, তখন শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের দিয়ে নিজেদের পরিচর্যা করাবে, তাঁদের উপদেশ দেবে, এবং 'ভো' বলে সম্বোধন করবে। এই চূড়ান্ত অধর্মের অবসানের উদ্দেশ্যেই কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন। মনুস্মৃতিনির্দিষ্ট শূদ্রদের আর্থসামাজিক অবস্থানের সঙ্গে মহাভারতের এই চিত্রের হুবহু মিল আছে।

বৈদিক যুগের কাছাকাছি সময়ে লিখিত মূল ক্ষত্রিয়কাহিনীতে সম্ভবত নারীদের বেশ কিছুটা মর্যাদা এবং স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের যুগে, বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের ফলে, ক্রমশ মনুস্মৃতি-প্রমুখ ধর্ম-শাস্ত্রে নির্দিষ্ট নারীর হীনস্থান মহাভারতেও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করা বর্তমানে অসম্ভব। পল্লবিত বেদব্যাসী মহাভারতে সামগ্রিকভাবে নারীর যে স্থানাঙ্ক নির্ধারিত হয়েছে তা সম্পূর্ণই অমর্যাদাকর। কাহিনীর সর্বত্রই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কিংবা ক্ষত্রিয়দের সামনীতিতে প্রায়ই শত-শত সালংকারা সুন্দরী যুবতীকে পণ্যের মতো দান এবং গ্রহণ করা হচ্ছে। বকরাক্ষসবধের কাহিনীতে ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলছেন, যে উদ্দেশ্যে লোকে ভার্যা গ্রহণ করে তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কারণ তিনি এক পুত্র ও এক কন্যার জনক হয়েছেন। ব্রাহ্মণী রাক্ষস দ্বারা নিহত হলে ব্রাহ্মণ আবার বিবাহ করতে পারবেন, কারণ পুরুষের বহুবিবাহ ধর্মসম্মত। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর পুনর্বিবাহ ঘোর অধর্ম। দ্রৌপদীর

পঞ্চস্বামীর সঙ্গে বিবাহের সময় তাঁর নিজের মত জিজ্ঞেস করা হয় নি। কুন্তী দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই লব্ধবস্তু পাঁচ ভাইকে ভাগ করে নিতে বলেছেন, আর এ কারণেই সকলে মিলে তাঁকে বিবাহ করলেন —এই প্রচলিত বিশ্বাসও ভ্রান্ত। দ্রৌপদীকে দেখবার পর কুন্তী নিজেই বললেন যে তিনি অধর্ম করে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথমে পঞ্চপাণ্ডবও কুন্তীর কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন যে তিনি দ্রৌপদীকে জয় করেছেন বলে দ্রৌপদী তাঁরই প্রাপ্য। অর্জুন বিনয়সহকারে বললেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই আগে বিবাহ করা উচিত, অতএব যুধিষ্ঠিরই দ্রৌপদীকে বিবাহ করুন। তবে তাঁর চার ভ্রাতা এবং দ্রৌপদী তাঁরই ইচ্ছাধীন। কিন্তু ততক্ষণে পঞ্চভ্রাতা সকলেই দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যদর্শনে কামাসক্ত হয়ে পড়েছেন। 'ভক্তিস্নেহকৃত অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট ও তদ্গতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনঙ্গবিকার প্রাদুর্ভূত হইল।··· যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া···এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জনে লইয়া কহিলেন, 'দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্যা হইবেন।'[১৯] তারপর যুধিষ্ঠির ও ব্যাসদেব নারীর একাধিক স্বামীর সঙ্গে বিবাহের কিছু পৌরাণিক উদাহরণ দিয়ে এই বিবাহকে সমর্থনের একটা উপায় বের করলেন। অর্থাৎ মহাভারতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, কামাসক্ত হয়েই পঞ্চপাণ্ডব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে দ্রৌপদীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে সকলে একসঙ্গে বিবাহ করেছিলেন, মাতৃবাক্যের সম্মানে নয়। পরে ব্যাসদেব তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে সুন্দ-উপসুন্দের পরস্পরকে হত্যার উপাখ্যান বলে পাণ্ডবদের উপদেশ দিলেন যে তাঁরা যেন প্রত্যেকে সময় ভাগ করে আলাদাভাবে দ্রৌপদীর সঙ্গে সহবাস করেন। মহাকাব্যের রচয়িতা দ্রৌপদীর নিজ অভিপ্রায়ের কোনো মূল্যই দেন নি।

কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়েও দ্রৌপদী-চরিত্রে নারীর হীনস্থান বারবার প্রকাশ পেয়েছে। পাশাখেলার সময়ও যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর মতামত না নিয়েই তাঁকে পণ রাখেন। অবশ্য আগে নিজেকে পণ রেখে হেরে যাবার পরে। এ অবস্থায় দ্রৌপদীকে পণ রাখবার তাঁর অধিকার ছিল কিনা—দ্রৌপদীর এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির সহ সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরেরা নীরব থাকেন, কারণ তাঁরা নারীকে দ্রব্য হিসেবে গণ্য করতেই অভ্যস্ত। আর উপস্থিত ব্রাহ্মণপুরোহিতেরা নীরব থাকেন, কারণ তাঁরা ক্ষত্রিয়ের অন্নভোজী। বনপর্বে কৃষ্ণপত্নী সত্যভামাকে দ্রৌপদী জানাচ্ছেন, পঞ্চস্বামীকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে তিনি সপত্নীদের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে তাঁদের সেবা করেন। স্বামীরা স্নান, ভোজন, শয়ন করলে তারপরই তিনি করেন। স্বামীরা বাইরে থেকে আসামাত্র তিনি তাঁদের আসন ও জল দিয়ে সংবর্ধনা করেন। তাঁরা যা আহার বা পান করেন না, তিনিও তা করেন না। তিনি সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠেন এবং সকলের পরে শুতে যান। অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকে এদেশের ধর্মশাস্ত্রে সমস্ত পরিবারের অবৈতনিক দাসী হিসেবে নারীদের যে স্থান নির্দিষ্ট আছে, দ্রৌপদীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু এত করেও স্বর্গারোহণের পথে তাঁর পতন হল, কারণ তাঁর মনের গহনে নাকি অর্জুনের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল। বললেন কোনো নিরপেক্ষব্যক্তি নয়, জ্যেষ্ঠ স্বামী যুধিষ্ঠির। এদিকে তাঁর স্বামীরা যত্রতত্র, সময়ে অসময়ে, বহু বিবাহ করেছিলেন বলে মহাকাব্যে তাঁদের কোনো বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় নি। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী স্বয়ং কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে তার ষোলো হাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। এ ছাড়া তাঁর আরও দশবারোজন পত্নী ছিলেন। চোখে কাপড় বেঁধে গান্ধারীক-র্তৃক স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণের মাধ্যমে মহাকবি ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট পাতিব্রত্যধর্মের চরম উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুরূপ আত্মত্যাগের কোনো উদাহরণ মহাভারতে নেই, কারণ তা ছিল ধর্মশাস্ত্রের পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে গান্ধারীর চোখ খোলা থাকলেই স্বামীস্ত্রী উভয়েরই অনেক বেশি সুবিধা হত।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন বলছেন যে অধর্মের ফলে কুলস্ত্রীরা ভ্রষ্টা হন, ফলে বর্ণসংকর হয়, আর পরিণামে সমস্ত কুল নরকে পতিত হয়।[২০] কৃষ্ণ গীতার নবম অধ্যায়ে বলেছেন, আমাকে আশ্রয় করে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি পাপযোনিও পরম গতি লাভ করে, ব্রাহ্মণ আর রাজর্ষিদের মতো পুণ্যবান ভক্তদের আর কথা কি?'[২১] বিশেষত অনুশাসনপর্বে ভীষ্মের মুখে যে ভাষায় ও ভাবে স্ত্রীজাতির নিন্দা করা হয়েছে, তা থেকে ধর্মশাস্ত্রীয় যুগে সমাজে নারীদের হীনস্থান বিশেষভাবে পরিস্ফুট। প্রথমে অপ্সরা পঞ্চচূড়ার উপাখ্যানের মাধ্যমে ভীষ্ম বললেন: 'কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর প্রাপ্ত হইলেই ধনবান ও রূপবান পতিদিগকে পরিত্যাগপূর্বক পরপুরুষসম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। ···যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা অগ্নির, অসংখ্য নদী দ্বারা সমুদ্রের ও সর্বভূতসংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষ সংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না।'[২২] এই উদ্ধৃতির বর্জিত অংশে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এমন আরও সব কথা আছে যা সম্পূর্ণ অশ্লীল এবং একমাত্র বর্বরের লেখনী কিংবা মুখ থেকেই বেরুতে পারে। তারপর যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করবার অজুহাতে এ ধরনের আরও কিছু কুৎসিত কথা ভীষ্মকে বলার পর ভীষ্ম বললেন: 'ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু, এই সমুদয়ের সহিত উহাদের তুলনা করা যায়। ···স্ত্রীগণের প্রতি কোনো কার্য বা ধর্ম নির্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্যবিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদিনী। ···মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না।'[২৩]

সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো সম্বন্ধে পরিশেষে উল্লেখ্য, ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠদের অকুণ্ঠ এবং অন্ধ আনুগত্যও পল্লবিত মহাভারতকাহিনীর একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্ম, পিতা ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতৃব্য ধর্মাত্মা বিদুরের কোনো কথাই শোনেন না। কিন্তু আদর্শ চরিত্র বলে চিহ্নিত পাণ্ডবেরা পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন। যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলার নেশা অথচ খেলায় অপটুতা, দায়িত্বজ্ঞানহীন পণরাখা, আপাতধার্মিকতা এবং দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল ব্যক্তিত্ব পাণ্ডবদের প্রায় সব দুর্দশার মূল উৎস। কিন্তু তথাপি শেষ পর্যন্ত চার অনুজ এবং দ্রৌপদী তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত। এমনকী পাশাখেলায় চার ভাইকে পণ রাখবার জন্যে এবং দ্বিতীয়বার বনগমনের পণ রাখবার জন্যে ভাইদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করবার প্রয়োজনও যুধিষ্ঠির বোধ করেন নি। চার অনুজ এবং দ্রৌপদী অনেকবার যুধিষ্ঠিরকে দোষারোপ করেছেন, এবং বলেছেন যে যুধিষ্ঠিরই তাঁদের সমস্ত দুঃখের জন্যে দায়ী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের কোনো ইচ্ছা বা কাজেরই তাঁরা বিরোধিতা করেন নি। দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর অপমানে ক্রুদ্ধ ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন: 'হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত বেশ্যাগণকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না, তাহারা তাহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। দেখো, কাশীশ্বর ও অন্যান্য ভূপালগণ যে সমুদয় ধন, উত্তমোত্তম দ্রব্যজাত ও রত্নসমূহ উপহার দিয়াছিলেন, তৎসমুদয়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও আয়ুধসকল এবং তোমাকে ও আমাদিগকে শত্রুগণ দ্যূতে পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু তুমি আমাদের

সকলের অধীশ্বর বলিয়া আমি তাহাকেও ক্রোধ করি নাই। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করা আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। দেখো, দুরাত্মা ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ কেবল তোমার দোষেই পাণ্ডবপ্রণয়িনী বালা দ্রৌপদীকে ক্লেশ দিতেছে। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছি। অদ্য তোমার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিব। সহদেব, ত্বরায় অগ্নি আনয়ন করো।'[২৪] কিন্তু অর্জুন তাঁকে এই বলে শান্ত করলেন: 'ধর্মাচরণ করো। ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করিও না।'[২৫] এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ মহাভারতে আছে। রামায়ণে যেমন রামের প্রতি লক্ষ্মণ ও ভরতের অকুণ্ঠ আনুগত্যের মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রের জয় ঘোষণা করা হয়েছে, মহাভারতেও তেমনি যুধিষ্ঠিরের প্রতি চার অনুজ পাণ্ডবের অন্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে ধর্ম-শাস্ত্রীয় অনুশাসনের জয় সূচিত হয়েছে।

পাঁচ

মহাকাব্য মহাভারতে অতএব সত্যাদর্শের প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া কঠিন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি সত্যনিরপেক্ষ। সেখানে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অথবা জাতিকুলের স্বার্থরক্ষার জন্যে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করা যায়। সেখানে ছলনা, কপটতা, যুদ্ধের পূর্বস্বীকৃত নিয়মভঙ্গ, অমানবীয় নরহত্যা এবং বীভৎসতা সবই ধর্মের অঙ্গ। ধনলাভ, জয়লাভ, রাজ্যলাভই প্রধান উদ্দেশ্য। আর সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে-কোনো অসত্য এবং অন্যায় নীতি অবলম্বনই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত। সে ধর্ম শাস্ত্রীয় ধর্ম, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম নয়। মহাভারতে কৃষ্ণ মিথ্যা এবং ছলনার উপর প্রতিষ্ঠিত কৌটিল্যীয় রাজনীতির প্রধান প্রবক্তা এবং উপদেষ্টা। জরাসন্ধবধের মন্ত্রণার সময় কৃষ্ণ নিজেকে কৌশলজ্ঞ বলে অভিহিত করেন। এই কৌশলজ্ঞ কৃষ্ণকেই আমরা মহাভারতে বারবার দেখি, সত্যনিষ্ঠ কৃষ্ণকে নয়। আর এই কৃষ্ণ-কৌটিল্য রাজনীতি আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও একশ্রেণীর রাজনীতিকের প্রেরণার উৎস, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মহাভারতের যুগের ক্ষত্রিয়েরা যেমন নিজের ও নিজ পরিবারের জন্য রাজ্য এবং ধনসম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হতেন, আর মিথ্যাভাষণ, ছলনা, কপট যুদ্ধ অথবা যে-কোনো অমানবিক আচরণ থেকে বিরত হতেন না, বর্তমান কালের এক ধরনের রাজনীতিও অনেকটা সেভাবেই পরিচালিত হয়। এ ধরনের রাজনীতিতে সিংহাসন-লোভীরা, আর তাদের চারিদিকে চেট, বিট, শকারেরা দ্রুত ধনসম্পত্তি লাভ তথা জনগণের উপর প্রভুত্ব লাভের উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করেন। আর এই উদ্দেশ্যে যে-কোনো অসত্য, অন্যায়, এবং মানবতাবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হতে দ্বিধা করেন না। মহাভারতের রাজনীতির ট্র্যাডিশন বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতেও সমানে চলেছে। এই রাজনীতির একমাত্র বিকল্প হতে পারে ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থের অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত গণকল্যাণমুখী মানবতানিষ্ঠ কোনো রাজনৈতিক আদর্শ। যেখানে মানুষ নিজেকে শুধু এক সুউচ্চ মানবিক আদর্শ এবং ইতিহাসের অগ্রগতির নিঃস্বার্থ সৈনিক হিসেবেই গণ্য করবে। মহাভারতের অসত্য ক্ষত্রিয়াচারকে বর্জন না করলে সত্য আর মানবতার আদর্শে উজ্জ্বল কোনো নবতর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

সমকালীন আর্থসামাজিক কাঠামোতে শূদ্র এবং নারীদের ধর্মশাস্ত্রনির্দেশিত যে হীনস্থান মহাভারতে প্রতিফলিত, তাও মানবিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতএব অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক কাঠামোও এই প্রাচীন কাঠামোকে পেছনে ফেলে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। এদেশে নারী এবং শূদ্র মুষ্টিমেয় পরগাছা

শ্রেণী দ্বারা আজও দিকে-দিকে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, শোষিত, দগ্ধ। আর অচলায়তন এই আর্থসামাজিক কাঠামো শুধু যে বহু শতাব্দী ধরে ইতিহাসের পথের ধারে জগদ্দল পাথরের মত ভারতবর্ষকে ফেলে রেখেছে তাই নয়, জনগণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশের শক্তি এবং মানবিক অধিকারকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দিয়ে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করেছে। অতএব মহাভারতের মানবতাহীন ও অসত্য সামাজিক মূল্য-বোধকে ধর্মের আবরণে পুনরুজ্জীবিত না করে তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করাই হবে প্রকৃত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রতিশ্রুতি। তেমনিভাবে ব্যক্তিগত আনুগত্যের পরিবর্তে শুধুমাত্র আদর্শের প্রতি আনুগত্যই মানবতা-নিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হতে পারে। মহাভারতের কৃষ্ণ-কৌটিল্য রাজনীতি অনুসরণ করে নয়, শোষণ ও দমনমূলক সনাতন রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক কাঠামোকে বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের ভিত্তিতে নূতন রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কাঠামো নির্মাণই শূদ্র ও নারী-সহ গণমুক্তির একমাত্র উপায়।

তবুও কুরুক্ষেত্রের মানস প্রান্তর বিপ্লবের ধ্রুব-তারা, যেখানে যুগসন্ধিতে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের প্রয়োজনে দ্বিমেরু সৈন্যসজ্জা হয়। মহাভারতের যুদ্ধ ন্যায় ও সত্যের জন্যে হয় নি। অন্যায় ও অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন রাষ্ট্রীয় এবং আর্থসামাজিক কাঠামো আর সে কাঠামোর সমর্থনে রচিত স্মৃতি-শাস্ত্রের ভ্রান্ত মূল্যবোধকে রক্ষার জন্যেই কবির কল্পনায় সে যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগণিত শহিদকে কাল্পনিক কুরুক্ষেত্রের চেতনা উদ্বুদ্ধ করেছে। মানবিক মূল্য-বোধকে ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে আগামী দিনেও দেশে-দেশে দ্বিমেরু সৈন্যসজ্জার প্রয়োজন আছে। কুরুক্ষেত্রের চিরন্তন তাৎপর্য এখানেই। বলা বাহুল্য, আগামী দিনের কুরুক্ষেত্রে যা সংঘটিত হতে চলেছে তা রাজ্যলোভী ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতিযুদ্ধ নয়। তার শ্রেণীবিন্যাস এবং ব্যূহরচনা হবে অবতারের কৌশলে নয়, গণদেবতার অঙ্গুলি-নির্দেশে। কিন্তু ইতিহাসে কুরুক্ষেত্র বারবার আসে এবং আসবে।

পাদটীকা

১। মহাভারতের মনুস্মৃতির প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, *The Laws of Manu*, translated with extracts from seven commentaries by G. Buhler, ed. F. Max Muller, Clarendon Press, Oxford, 1886, Introduction.

২। বেদব্যাস-বিরচিত কালীপ্রসন্ন সিংহ -অনূদিত মহাভারত, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৫, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১২১২। এরপর থেকে এই সংস্করণকে বেদব্যাসী মহাভারত নামে উল্লেখ করা হবে।

৩। ওই, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২২৩-২৪।

৪। ওই, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪১৫-১৬, ৫১৩, ৫৬১।

৫। বঙ্কিম-রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৫৬২-৬৭।

৬। সত্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামতের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Jayantanuja Bandyopadhyaya, *Social and Political Thought of Gandhi*, Allied Publishers, New Delhi 1969 chs. 2-3.

৭। বেদব্যাসী-মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১০১৪-১৫।

৮। ওই, পৃ ১০৩৫।

৯। ওই, পৃ ১০৩৬।

১০। ওই, পৃ ৯২১-২২।

১১। ওই, পৃ ১২৫৯।

১২। ওই, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৪৫-৪৬।

১৩। ওই, পৃ ১৫২।

১৪। ওই, পৃ ১৫৩।
১৫। ওই, পৃ ১৪৯।
১৬। ওই, পৃ ৩০২।
১৭। ওই, পৃ ৩৪১।
১৮। ওই, পৃ ৩৩৬।
১৯। ওই, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৩৫।
২০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১/৪০-৪১।
২১। ওই, ১/৩২-৩৩।
২২। বেদব্যাসী মহাভারত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৮৭-৮৮।
২৩। ওই, পৃ ২৮৯-৯০।
২৪। ওই, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪২০।
২৫। ওই।

বিদ্বিষ্ট সম্প্রদায়-চেতনার গোড়ার কথা

আহমদ শরীফ

জ্ঞানী-গুণীদের ধারণা ভারত-উপমহাদেশে বিজাতি-দ্বেষণা এবং সাম্প্রদায়িকতার উৎস হচ্ছে মধ্যযুগের তুর্কী-মুঘল শাসনে হিন্দুপীড়ন, ব্রিটিশ শাসনে সুপ্রযুক্ত ভেদনীতি, আর ইংরেজি শিক্ষায় সাধারণভাবে হিন্দুর প্রাগ্রসরতা, অর্থসম্পদে একক ঋদ্ধি এবং তাদের সংখ্যাগুরুতা বা অধিজনতা। ওই ধারণা আজ অবধি গোটা উপমহাদেশে জনজীবনে মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অপরিমেয় ক্ষতি করেছে।

দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়েছে ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই। এর আগে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বা শাসক-শাসিতের মানস-দ্বন্দ্ব এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পীড়ন-বঞ্চনা সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটাতে পারে নি। কেননা, শহরে শাসনকেন্দ্রে শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি-সাহস ছিল না হিন্দুর। আর গাঁয়ে-গাঁয়ে দেশজ মুসলিমরা ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীর, নিম্নবর্ণের এবং নিম্নবর্গের ক্ষুদ্র-বৃত্তিজীবী, আর নিতান্তই উনজন। এরা ছিল অর্থ-সম্পদ-শিক্ষার অধিকারী বর্ণহিন্দুর প্রশাসনে। বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে তুর্কী-মুঘল আমলের প্রশাসনিক পদবী আজো চালু রয়েছে। তা ছাড়া, দেশজ দরিদ্র নিরক্ষর মুসলিমদের প্রতি হিন্দুর মনস্তাত্ত্বিক অবজ্ঞা তার সাক্ষ্য। উল্লেখ্য যে, পূর্ব-পানজাব থেকে ভারতবর্ষের পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে বর্ণহিন্দুরা কোথাও অন্য কোনো কারণে বিপন্ন না হলে ইসলাম বরণ করে নি। কারণ তারা ছিল শূদ্রসেব্য। মানবসাম্যের ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের আচণ্ডালে কোল দিতে হত, খেতে হত এক পাতে, বসতে হত গা ঘেঁসে—এ ছিল পুঁজিপতি মিল-মালিকের ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হওয়ার মতো অসম্ভব ঘটনা আর অবাস্তব চেতনা। তাই দক্ষিণ-পূর্ব আর উত্তর ভারতে ইসলাম বর্ণহিন্দুর পক্ষে আকর্ষণীয় হয় নি। আর জোর করে তরবারির সাহায্যে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করলে গোটা য়ুরোপের খ্রীষ্টানের মতোই সর্বত্র মুসলিমই থাকত। তুর্কী-মুঘলের রাজধানী এবং প্রশাসনকেন্দ্রেও কোথাও মুসলিম-অধিজন ছিল না। বেসামরিক প্রশাসনে তো বটেই, এমনকী সৈন্য-

বাহিনীতেও হিন্দু সিপাহি আর সেনানীর সংখ্যা কম ছিল না। হিন্দুবিদ্বেষী বলে কুখ্যাত আওরঙ্গজেবের সময়ে বরং হিন্দু পদস্থ চাকুরের সংখ্যা ছিল প্রায় শতকরা তেত্রিশ জন। এত হিন্দু আকবরের সময়েও সরকারি চাকুরিতে ছিল না।

শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিহিন্দুর হত্যা বা লাঞ্ছনা, এবং যুদ্ধকালে বা অন্য সময়ে মন্দিরে আশ্রিত শত্রুর কিংবা অপরাধীর সন্ধানে মন্দির-মূর্তিভাঙাকে ব্রিটিশ শাসক-ঐতিহাসিকরা ফলাও করে ত্রাসকর হিন্দুপীড়নরূপে চিত্রিত করেছেন। ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ-অবমানিত হিন্দু পাঠকও যুক্তিবুদ্ধিপ্রয়োগে তা সম্ভব কি অসম্ভব, বাস্তব কি বানানো—তা বিচার না করেই করেছে বিশ্বাস। নব-আবিষ্কৃত তথ্যপ্রমাণে দেখা যাচ্ছে—ব্যক্তিগত দ্রোহে-অপরাধে দোষী ধনী-মানী-সামন্ত-প্রশাসক হিন্দুর প্রাণদণ্ড হয়েছে, অর্থসম্পদ হয়েছে বাজেয়াপ্ত। আর, তুর্কী-মুঘল অনেক শাহ-সামন্ত-শাসক-প্রশাসক মন্দিরে অর্থ আর ভূমি দান করেছেন। ব্রিটিশ আমলে প্রযুক্ত ভেদনীতির কুয়াশাচ্ছন্ন, অসুস্থ আর অসুস্থ পরিবেশে কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগেরও গরজ বোধ করে নি ব্রিটিশ-রচিত ইতিহাসের পাঠক, এবং সাম্রাজ্যবাদী এলিয়ট-ডাওসনের দুষ্টবুদ্ধি- এবং অভিসন্ধি-প্রসূত খণ্ডিত আর বিকৃত অনুবাদে পরিবেশিত তথ্য হিন্দু পাঠকমনে জাগিয়েছিল তুর্কি-মুঘলের এবং সাধারণ-ভাবে মুসলিমের প্রতি ক্ষোভ-ক্রোধ-বিদ্বেষ-ঘৃণা, আর মুসলিমদের রেখেছিল লজ্জিত। কাণ্ডজ্ঞান তথা যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই বোঝা যেত যে,

(১) গোটা ভারতবর্ষ কখনো একই সময়ে তুর্কী-মুঘল শাসনে ছিল না—বিজয়নগর প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল, স্বশাসিত রাজস্থানের রাজ্যগুলো ছিল—বলতে গেলে, সে যুগের নিয়মে প্রায় গোটা ভারতবর্ষই ছিল সামন্তশাসিত। এবং না বললেও চলে যে, শতকরা পঁচানব্বই জন সামন্তই ছিলেন হিন্দু। কেননা উত্তর-পশ্চিমের একটা অঞ্চল ব্যতীত দেশটা ছিল হিন্দু-অধ্যুষিত। কাজেই, তুর্কী-মুঘল শক্তি সার্বভৌম ছিল বটে, কিন্তু তাদের প্রত্যক্ষ শাসন ছিল না বলে তারা অত্যাচার করার সুযোগটাই পায় নি। আর, প্রশাসনিক কাজে যে হিন্দুই থাকত, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, শিকদার, মহলানবিশ, সেহলানিশ, মজুমদার, খাস্তগীর, দস্তগীর, দস্তিদার, সাধুখাঁ, সরকার প্রভৃতি।

(২) রাজার লক্ষ্য সম্মান আর সম্পদ, রাজা রাজস্ব পেলেই, আর আনুগত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেই, অত্যাচার-পীড়ন করার কারণ থাকে না। কাজেই বিধর্মী রাজার প্রজার ধর্মবিশ্বাসের বা শাস্ত্রাচারের প্রতি অবজ্ঞা থাকে বটে, যে-কোনো আস্তিকের পরধর্মে অবজ্ঞা থাকেই, কিন্তু প্রজার ধর্ম কাড়ার দুর্মতি রুচিৎ কোনো স্থূলবুদ্ধি রাজার ঘটতে পারে—সবার কথনোই নয়। ভারতবর্ষে সর্বত্র মুসলিম যেহেতু উনজন, সেহেতু তুর্কী-মুঘল যে স্বধর্মপ্রচারে আগ্রহী ছিল না, তা স্বতঃপ্রমাণিত।

(৩) বাঙলাদেশে নওয়াব মুর্শিদকুলি খান যে ইজারাদারি ব্যবস্থা চালু করলেন, তাতে মুসলিম ইজারাদার ছিল নগণ্য। কারণ, নিম্নবর্ণের এবং নিম্ন-বর্গের আর নিম্নবৃত্তির হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষিত ধনী-লোক ছিল না। বিদেশাগত উর্দুভাষী মুসলিমই হয়েছিল ইজারাদার। এমনি অবস্থা ছিল ভারতবর্ষের সর্বত্র। তাই মুঘলশাসনের অবসানকালে যে ছোটো-বড়ো প্রায় সাড়ে সাতশ সামন্ত-জমিদার-তালুকদার-জায়গীরদার রইলেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় করগণ্য কয়জনই ছিলেন মাত্র মুসলমান।

(৪) ভারতবর্ষের সর্বত্র দেশজ মুসলিমমাত্রই সাধারণভাবে নিরক্ষর এবং দরিদ্র পেশাজীবী ও প্রান্তিক চাষী। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, তবে তা মুসলিম সমাজের আর্থিক-শৈক্ষিক-সাংস্কৃতিক জীবন প্রভাবিত করতে পারে নি। শাস্ত্রিক-সামাজিক জীবনেই ছিল তাঁদের প্রভাব সীমিত। অতএব, তুর্কী-মুঘল আমলে নানা কারণে ধনী-মানী-সামন্তশ্রেণীর ব্যক্তিহিন্দু শাস্তি বা নির্যাতন পেয়েছে, প্রজা হিসেবে জাতিহিন্দু নির্যাতিত হয় নি; রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক মুখ্যত রাজস্ব দেয়া-নেয়ার, এবং অনুগত থাকা না-থাকার। এতে বিপর্যয়-ব্যতিক্রম-ব্যত্যয় না ঘটলে, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের, প্রজাপীড়নের কারণ ঘটে না।

(৫) ব্রিটিশ আমলে হিন্দুর অর্থ-সম্পদ-শিক্ষা-দর্প-দাপট দেখে মুসলিমদের চোখ টাটাল। তা তাদের অজ্ঞতারই ফল। কেননা, তুর্কী-মুঘল আমলেও সাধারণভাবে অর্থ-বিত্ত-বেসাত ছিল বর্ণহিন্দুর কবলেই। তখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বড়ো প্রশাসন-কেন্দ্রগুলোতে ইরাকি-ইরানি মধ্যএশীয় চাকুরে আর ব্যবসায়ীরা। ওরা কিন্তু সংখ্যায়ও বেশি ছিল না। সবাই এদেশের স্থায়ী বাসিন্দাও ছিল না। মুঘল রাজত্বের অবসানে দেখা গেল—ধনী-মানী-সামন্ত-জমিদার মুসলমানমাত্রই উর্দুভাষী তথা বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বংশজ। খাঁটি দেশজ মুসলিম বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। ব্রিটিশ আমলে ইতিহাসে অজ্ঞ মুসলিমরা, বিশেষ করে বাঙালি মুসলিমরা মনে করল—বুঝি ইংরেজ প্রতিপোষণেই বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে-দফতরে হিন্দুরা প্রতিষ্ঠা পেয়ে প্রবল হল, আর বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত ও দফতর -চ্যুত হল মুসলিমরা। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র তথ্য নেই, নেই সত্যের সমর্থন। ইংরেজ আমলে নতুন ভূমিব্যবস্থায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপ্রভাবে পণ্যবিনিময়ভিত্তিক গ্রামীণ বৃদ্ধি-জীবীদের আর্থ-বাণিজ্যনীতির বিনাশে, প্রশাসনিক বিবর্তনে এবং শিক্ষার ঐতিহ্যহীন শিক্ষাবিমুখ দেশজ মুসলিম সমাজে ওকালতি-ডাক্তারি-চাকুরিরও নতুন নিয়মের বেনে-ফড়ে-দালাল-দেওয়ানের অভাবে, এবং প্রজন্মক্রমে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, সম্পত্তির বিভাজনে দারিদ্র্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর, বর্ণহিন্দু সমাজে অর্থসম্পদ এবং শিক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছিল প্রায় বিনা প্রতিযোগিতায় আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। হিন্দুরা মুসলিম সম্পদ কাড়ে নি, ওরা সম্পদ তেমন হারায়ও নি, ওদের অর্জন ছিল না, ছিল ক্ষয়ই কেবল। চাকরি আর সম্পদ, দর্প আর দাপট, ক্ষমতা আর প্রভাব, মান আর মর্যাদা হারিয়েছিল শাসক-প্রশাসকগোষ্ঠীর ও শ্রেণীর বিদেশাগত তুর্কী-মুঘল বংশধরেরা। সেনাবিভাগে তাদের চাকরি গেল, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগেও তারা কাজী আমিন-ফৌজদারি হারাল, ইংরেজি চালু হওয়ায় ১৮৬০ সনের ওকালতি পেশাও তাদের হারাতে হল। এরা অবশ্য পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই দেশত্যাগ করে উত্তর-ভারতে এবং ভারতের বাইরে চলে গেছে। কেবল শাসনকেন্দ্রে শহর অঞ্চলে উর্দুভাষী দরিদ্র পেশাজীবীরা থেকে গেছে, যাদের অবজ্ঞায় খোট্টা বা কুটি বলা হয়।

অতএব তুর্কী-মুঘলের হিন্দুপীড়ন, হিন্দুহত্যা, ভয়-ও -বলপ্রয়োগে ধর্মান্তর ব্রিটিশ আমলে অভিসন্ধিবলে বানানো অযৌক্তিক-অবাস্তব "মিথ" মাত্র। তেমনি, ব্রিটিশ সহযোগিতায় দেশজ মুসলিমদের অর্থসম্পদ হিন্দুকবলিত হওয়ার কিসসা আর ক্ষোভ অকারণ। তা ছাড়া, জাত হিসেবে মানুষ ভালোমন্দ হয় না, হয় ব্যক্তি হিসেবে। একালে হিন্দু-মুসলিমের নিজেদের স্বার্থেই সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায়, নিরাপদ-স্বস্তিতে সহাবস্থানের জন্যে তথ্যভিত্তিক ইতিহাস রচনায় ও পাঠে আগ্রহী হওয়া আবশ্যিক। বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদন আজো সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন বাঙালিদের —'আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গলার বাঙ্গালির ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক। ক্ষুদ্রকীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।' (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড) একালে অতীতের ইতিহাসগত ঘটনার বা আচরণের ন্যায়-অন্যায় দৈশিক, কালিক, শাস্ত্রিক নীতি-নিয়মের মানে-মাপে-মাত্রায় বিচার্য।

এ সূত্রে আরো একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন—তা হচ্ছে: ব্যক্তিক বা পারিবারিক জীবনে মানসিক বা শৈক্ষিক, আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক

অবক্ষয় থাকলেও সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামুহিক বিচারে এবং হিসেবে চিরকালই মানুষের দেহে-প্রাণে-মনে-মননে উৎকর্ষ ঘটছে। ব্যক্তিগত জীবনে উঠতি-পড়তি-ঘাটতি যেমন আছে, তেমনি দেশগত এবং কালগত মানুষের জীবনেও একপ্রকারের বন্ধ্যাত্ব, স্থবিরত্ব আর আচারসর্বস্বতা আঞ্চলিকভাবে কিছু-কালের জন্যে প্রকট হয়ে ওঠে। একেই বলে অবক্ষয়। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সৃষ্টিশীলতা চালু থাকে, সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ-বিকাশ-প্রসার হতে থাকে। এ হিসেবে, মননে-আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সংস্কৃতি-সভ্যতা ক্রমোন্নত হচ্ছে; কাজেই, আমরা যত অতীতে যাব, মানুষের মানসিক-ব্যবহারিক-আচারিক অপূর্ণতা ততই দৃষ্টিগোচর হবে। প্রতি মুহূর্তে মানুষের অজ্ঞতা কমছে, জ্ঞান বাড়ছে, বুদ্ধি সূক্ষ্ম হচ্ছে, অনুভূতি তীক্ষ্ণ হচ্ছে, উপলব্ধি স্পষ্ট, ব্যাপক আর গভীর হচ্ছে। কাজেই, অতীতমাত্রই বর্তমান কালের তুলনায় অধিক অজ্ঞতার, বিশ্বাসের, সংস্কারের, অলৌকিকতার, অলীকতার, বিস্ময়ের, কল্পনার, ভয়ের, ভক্তির, নিয়তি-নির্ভরতার, সংকীর্ণ চিত্ততার, অসহিষ্ণুতার, আত্ম-প্রত্যয়হীনতার কাল। জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিচালিত, সদিচ্ছা-সংযত মানুষ সেকালে একালের চেয়ে দুর্লভ ছিল। তাই দেখা গেছে—ইহুদি খ্রীষ্টানকে, ইহুদি-খ্রীষ্টান কাফের মুসলিমকে, এবং মুসলিমরা ইহুদি-খ্রীষ্টান কাফেরকে মানুষ হিসেবে সহজভাবে গ্রহণ করছে না। একটা বৈর-অবজ্ঞার ভাব মনের গভীরে পোষণ করছে। সে-কারণে, জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যে-শাক্তে-বৈষ্ণবে-শৈবে রেষারেষি হানাহানি ছিলই। মধ্যযুগে মুসলিমরা গির্জা-সিনাগগ-মঠ-মন্দিরের প্রসার পছন্দ করে নি। অজুহাত পেলেই ভেঙেছে। তেমনি, খ্রীষ্টানেরা ভেঙেছে মসজিদ। ইহুদিরা আর হিন্দুরা সে সুযোগ পায় নি। কিন্তু হিন্দু রাজা-জমিদার মসজিদ তৈরির, আজান উচ্চারণের এবং গোরুকোরবানির অনুমতি যে দেন নি, তেমন নজিরও কম নয়। এ মুহূর্তে সেক্যুলার ভারত সরকারও "গোরু জবেহ" নিষিদ্ধ করেছেন হিন্দুর আবদারে বা দাবিতে। এ যুগে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-শিক্ষার এবং আন্তর্জাতিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান-অভিজ্ঞতার প্রসারে মানুষ অনেক সহিষ্ণু সংযত-উদার এবং তুচ্ছ বিষয়ে উদাসীন হয়েছে। এ যুগে মনের গভীরে স্বধর্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আস্থা রেখেও, এবং পরধর্মে অবজ্ঞা পুষেও, মানুষ নিরাপদ স্বস্তিতে সহাবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অর্থ-সম্পদের লিপ্সা-প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা তেমন তীব্র এবং অসহ্য হলে প্রবল পক্ষ ধর্ম-মতের, নিবাসের কিংবা ভাষা-বর্ণ-শ্রেণীগত পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে বাধায় দাঙ্গা, প্রবৃত্ত হয় বিধর্মী-বিভাষী-বিজাতি-হননে-বিতাড়নে। তাই, আজো নিশ্চিন্ত নিরাপদে স্বস্তিতে বিধর্মীর বিভাষীর বিজাতির বিদেশীর সহাব-স্থান স্বাভাবিক এবং সম্ভব হচ্ছে না।

এ সমস্যার সমাধান করতে হলে সচেতনভাবে শিক্ষিত মানুষকে যুক্তিপ্রবণ এবং যুক্তি-আশ্রয়ী হতে হবে। যুক্তিবাদের প্রসারেই কেবল আস্তিক মানুষ এ মানসিক আধি আর সামাজিক ব্যাধি এবং রাষ্ট্রিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে। অথবা সমাজে নাস্তিকের সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি পেলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজে-রাষ্ট্রে দৃঢ়-ব্যাপক এবং গভীর হলে সমাজ আর রাষ্ট্র এ রোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ মনে হয় চিরকালই কল্পনা-বিস্ময়-ভয়-ভক্তি-ভরসায় চালিত হয়, কাজেই নাস্তিকের সংখ্যা বাড়বে না। অতএব বাকি থাকল জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা এবং শ্রেয়োচেতনা। এগুলোর সচেতন সযত্ন অনুশীলন আবশ্যিক এবং জরুরি।

ড্রাগনের ঘর-গেরস্তি

কামাল হোসেন

তখনো বিকেল গড়িয়ে যায় নি হুগলী নদীর ওপর। শীতকালে কলকাতার কুয়াশা আর নীলাভ ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ওপারের তীর ছুঁয়ে নদীর জলের গভীরে। এই রমণীয় কুয়াশার প্রবাহ যেন অবচেতনে কোনো রহস্যপথে প্রবেশ করে। অসম্ভব প্রাচীন এক রহস্যময় স্পন্দন অনুভূতির কোষে-কোষে অনুভব করে কিম থিয়াং।

গে রেস্ট্রেনটের দোতলায় জানলার ধারে মুখো-মুখি তারা বসে আছে বহুক্ষণ। দুই তরুণ তরুণী। কিম থিয়াং আর মি-লিন। তাদের মঙ্গোলীয় চেহারা দেখে সহজেই আর সকলে চিহ্নিত করতে ভুল করবে না। হ্যাঁ, তারা চীনা। খুব মৃদু কণ্ঠে "হাকা" নামক একটি চৈনিক উপভাষায় তারা কথাবার্তা বলছিল।

'এখানে বসে-বসে জানলা দিয়ে নদী দেখতে কী ভালো যে লাগছে, কিম!' মি-লিন বলল।

কিমের চওড়া কাঁধ। বলিষ্ঠ গড়ন। টকটকে লাল রঙের গেঞ্জি। মি-লিনের কথায় আর-একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল নদীর কুয়াশামাখা চালচিত্রের দিকে। নৌকা ভেসে যাচ্ছে। দূরে বড়ো-বড়ো জাহাজের দীর্ঘ অস্বস্তিকর প্রতীক্ষা।

'কথা বলছ না কেন, কিম?' মি-লিন শুধাল।

'আর বলার মতো কিছু বাকি আছে, মি-লিন?'

'শুধু-শুধু তুমি রাগ করছ, কিম!'

মি-লিনের সুরময় কণ্ঠস্বর টুং-টাং করে বাজে কিমের কানে। নিঃশব্দ কান্না তার হৃদয়ের ভাঁজে-ভাঁজে ঝরে পড়ে। অভিমানে কিছু কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। আপন মনে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে যায় সে।

কিমের তন্ময়তা ভেঙে দিয়ে মি-লিন মৃদু গলায় বলল, 'ছেলেমানুষের মতো রাগ কোরো না, কিম। আমার তো এখন কিছু করবার নেই। বাবা-মার সঙ্গে ক্যানাডায় চলে যেতে হবে।'

রেস্ট্রেনটে এ সময়টা বেশ ভিড় হয়। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত প্রশান্তির

ভাব এনে দিচ্ছিল। কলকাতার এই পশ্চিম প্রান্তে নদীতীরে মুখোমুখি বসে ওরা হয়তো কোনো দুরন্ত কালের ধ্বংস স্মৃতিকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছিল।

'কিম, তুমি গত বছর হঠাৎ আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম ছেড়ে ক্যাথলিক হয়ে গেলে, এতে আমার বাবা-মা খুব দুঃখ পেয়েছেন।'

খুব শীতল চোখে মি-লিনের দিকে তাকিয়ে কিম বলল, 'তুমি?'

হাসলে কিন্তু মি-লিনের একসারি সুন্দর দাঁতের আনাচে কানাচে আকাশের তরতাজা একফালি রোদ ঝলমল করে ওঠে। হাসি থামিয়ে শান্ত গম্ভীর গলায় সে বলল, 'আমার কাছে তুমি চিরকাল একই রকম থাকবে, আ-কিম। একথাটা তো আমি হাজার বার বলেছি তোমায়।'

'ক্যাথলিক হয়েছি বলে বৌদ্ধ মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করেছি? না আচার-আচরণ পালন কিছু করছি না?'

'আহা, তাই তো বলছি। সবই পালন করছ, অথচ হঠাৎ দুম করে ক্যাথলিক হয়ে গেলে, সেটাই মা-বাবার একটু অবাক লেগেছে।'

'তাঁরা কেন অবাক হয়েছেন, আমার মাথায় মোটেই ঢুকছে না। তাঁরা কি খবর রাখেন না, কলকাতার চীনাদের মধ্যে কতজন ক্রিশ্চান, কতজন মুসলমান? তোমার প্রাণের সখী বেনটিক স্ট্রীটের ফি-চেনও তো ক্যাথলিক!'

'ফি-চেন-এর খবর তুমি শুনেছ?'

'কী হল তার? সেনট্রাল অ্যাভিনিউয়ে মায়ের বিউটি পার্লারে কাজ করছিল না?'

'সে তো কাজ করছিল। ভালোই ছিল। দেখতে কী মিষ্টি।'

'এমন কিছু মিষ্টি না। একেবারে ঘরকুনো স্বভাব। তোমার সঙ্গে যতবার আমার কাছে এসেছে, একদিনও মুখে হাসি দেখি নি। ওরকম গোমড়ামুখো মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে মোটেই ভালো লাগে না।'

'না গো, ওরকম করে বোলো না। বড়ো দুঃখী মেয়ে। ঘটনাটা শোনোই না শেষ পর্যন্ত। মেয়েটা ইস্কুলে পড়াশুনো বেশিদিন করে নি। মায়ের বিউটি পার্লারে ঢুকে পড়েছিল। কাজকর্ম ভালোই করত। বাবা বেনটিক স্ট্রীটে একটা জুতোর দোকানে কাজ করে। আরো তিনটে বোন আছে সংসারে। তো, ফি-চেন-এর বাবা-মার কী দুর্মতি হল, মেয়েকে একা প্লেনে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়ায়।'

'কেন?' কিম শুধাল।

মি-লিন একটু হাসল। মাথা নাড়ল। বলল, 'বিয়ে করতে।'

'অ্যাঁ', কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আর-একটু হলেই বিষম খাচ্ছিল কিম। একটু সামলিয়ে বলল, 'কলকাতায় চীনা ছেলের অভাব?'

'ব্যাপারটা তোমায় বুঝিয়ে বলছি, কিম। ফি-চেন-এর এক আনটি থাকেন মেলবার্নে। তিনিই চিঠি লিখে তার মাকে জানিয়েছিলেন ওখানে ভালো ছেলে আছে। অবস্থাপন্ন ফ্যামিলির। ফি-চেনকে একা পাঠিয়ে দিলেই হবে। ওখানেই বিয়ে-থা হয়ে যাবে।'

'ভেরি গুড।' কিম টিপ্পনি কাটল।

'ওঁরা পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু কী স্যাড ব্যাপার, দু সপ্তাহ বাদে ফি-চেন প্লেনে ফিরে এল। পুরোপুরি উন্মাদ অবস্থায়। আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলছিল। বিনা কারণে হাসছিল, কাঁদছিল। মাঝে-মাঝে সাংঘাতিক রকম ভায়োলেনট হয়ে যাচ্ছিল। মজার কথা কী জান, সেই আনটি দু কলম চিঠি লিখেও এখনো পর্যন্ত জানাল না কেন ফি-এর এরকম অবস্থা হল। সেই বিয়েরও কী ব্যাপার ঘটল, তাও জানা গেল না।'

অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্ক গলায় কিম জিজ্ঞেস করল, 'ফি-চেন কেমন আছে এখন?'

'নার্সিং হোমে ভর্তি আছে। আমি গেছলাম দেখতে একদিন। অনেকটা ভালো আছে।'

মাথা নুইয়ে নাড়ল কিম। বলল, 'মানুষের জীবনে

কত কিছু যে ঘটে!'

'হুঁ।' মি-লিন চুপ করে থাকল। আর কিছু বলল না।

নদীর ওপরে এতক্ষণে অন্ধকার তার সান্ধ্যকালীন বিষণ্ণ ওড়না ছড়িয়ে দিয়েছে। নৌকা আর জাহাজের ইতস্তত আলোর বিন্দু। কোথাও কোনো সঙ্গীতের মূর্ছনা নেই। এই রেস্টুরেনটের মতো কৃত্রিম পরিবেশে হঠাৎ যেন হাঁফ ধরে উঠল কিমের। কোথাও যেন একটা কিছু পচেছে, হয়তো কোনো প্রাণী কিংবা মানুষের বিশ্বাসের মতো কিছু বিমূর্ত অস্তিত্ব। ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয়। বমি পায়। স্তব্ধতর হতে থাকে কোনো প্রাচীন অপচ্ছায়া।

উঠে দাঁড়ায় কিম। মি-লিন বলল, 'এখনই উঠবে?'

'চলো নীচে গিয়ে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াই। ওয়েটারটা অনেকক্ষণ ঘুরঘুর করছে। লোকজনের ভিড়ও বেড়ে গেছে।'

আউটরাম ঘাটের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে তারা। কয়েকজন নৌকার মাঝি শুধাল, 'নৌকায় যাবেন, স্যার?'

মাথা নেড়ে ধীর পায়ে তারা পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

'আ-মি!' কিম ডাকে।

'বলো।'

'ক্যানাডায় তুমি যেও না, মি-লিন।'

'ছেলেমানুষের মতো কথা বলো না, কিম। আমি বলি কী, সেনট জেভিয়ার্স থেকে তোমার বি-কম কোর্সটা কমপ্লিট করে চলে এসো ক্যানাডায়। তোমার দাদাও তো ওখানে আছেন। সেখানে বিয়ে করে আমরা দুজনে ঘর বাঁধব।'

আবছা অন্ধকারের মধ্যে মি-লিনের মুখের দিকে তাকাল কিম। ও টের পাচ্ছিল মি এখন স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছে। একটা চমৎকার সচ্ছল দ্রুতগতির জীবন তাকে ক্রমশ সম্মোহিত করছে। সেই পচধরা অস্বাস্থ্যকর গন্ধটা আবার কিমের নাকে ভেসে এল।

ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে কিম বলল, 'এই কলকাতা ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, মি-লিন। আমি অপেক্ষায় বসে থাকব। একদিন তুমি ফিরে আসবে আমার কাছে। স্কুটারের ব্যাক সীটে বসিয়ে তোমাকে নিয়ে ছুটে যাব বউবাজার স্ট্রীটে, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে, ইলিয়ট রোডে, ট্যাংরার 'চায়না টাউনে'। আমার মতো অসংখ্য চীনা সেখানে বাস করছে, কাজ করছে, উৎসব করছে।'

রাগি-রাগি গলায় মি-লিন বলল, 'তবু তোমরা কলকাতার কেউ নও। কলকাতা মানে বাঙালি আর তার দুর্গাপুজো। কলকাতা মানে মাড়োয়াড়ি আর তার বড়োবাজার। কলকাতা মানে মুসলমান আর তার নাখোদা মসজিদ কিংবা মহাম্মেডান স্পোর্টিং। সবাই আছে কলকাতায়। কেউ শিখ, কেউ মারাঠি, কেউ গুজরাতি, কেউ কেরেলিয়ান। তারা সবাই কলকাতার সভ্যতা আর সংস্কৃতির অঙ্গ। অ্যাংলো-ইনডিয়ান বৃদ্ধার একাকিত্ব নিয়ে অপর্ণা সেন ফিল্ম করেন। কিন্তু চীনা মানেই চীনদেশী। খাতায় কলমে তারা এদেশের নাগরিক হলেও সবাই বিশ্বাস করে তারা ভিনদেশী।

একটানা এতক্ষণ কথা বলে হাঁফাতে থাকে মি-লিন। তার ছায়ামাখা মুখে একটা করুণ অসহায়তা অনুভব করতে পারে কিম থিয়াং। মৃদু গলায় সান্ত্বনার সুরে সে বলল, 'মিথ্যে-মিথ্যে রাগ করছ, মি। তুমি যাদের কথা বললে এবং আমরা—সবাই এ শহরে আউটসাইডার। বহিরাগত। পৃথিবীর সব বড়ো শহরেরই ইতিহাস এরকম।'

'মর্ত্যের স্বর্গে তুমি বাস কর, কিম। চীনা বলতেই ওরা বোঝে জুতোর দোকান, লনড্রি, রেস্টুরেনট, দাঁতের ডাক্তার কিংবা ট্যানারির বিজনেস। সবাই আমরা যেন চীনের স্পাই। উঃ, কেন যে সিক্সটি-টু'র যুদ্ধটা হয়েছিল!'

'কেউ কেউ হয়তো আমাদের ভুল বোঝে। ফাদার জন সেদিন বলছিলেন, সব দেশেই মাইনরিটিরা

এরকম একটা সংকটের মধ্যে বাস করে। উনি খুব মজার একটা কথা বলেছিলেন। শুধু ধর্মীয় সংখ্যা-লঘুরাই নয়, চিন্তাজগতেও যাঁরা কিছুটা গতানুগতিকতার বাইরে বাস করেন, তাঁরাও কিন্তু এক ধরনের সংখ্যালঘু। আইডেনটিটি ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে তাঁদেরও পথ হাঁটতে হয়।'

একটা অপূর্ণতার হাহাকার ছলছল করে ওঠে দুজনের মনে। প্রাচীন নির্জনতা আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে দুজনকে। কোনো সুরম্য প্রাসাদের অন্দরমহলে বুঝি দাঁড়িয়ে আছে তারা। দূরে মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে ভেসে আসছে প্রার্থনাসঙ্গীতের গম্ভীর সুর। বেঁচে থাকার নানাবিধ তুচ্ছতা আর অসহায়তা তারা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যেতে চাইছিল। প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তুজগৎ থেকে তারা যেন আজ সত্যিকারের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ফিসফিস করে মি-লিন বলল, 'আমরা যেন একটা জাদুঘরের মধ্যে আটকা পড়ে আছি। চার-পাশে শুধু পুরোনো আর মরা জিনিস। আমি সত্যিকারের মানুষের মতো বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি, আ-কিম।'

'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব, মি-লিন।'

'তোমার কলকাতায় কী যক্ষের ধন আগলে রাখার জন্য থাকতে চাও, কিম?'

'আমি অপেক্ষা করব। তুমি ফিরে আসবে।' কিম বলল। তার স্বর বড়ো ক্লিষ্ট শোনাল।

দুই

আজ সকাল থেকেই ব্যস্ততা। কিমের ঠাকুরদার মৃত্যুর ছ বছর পর আজ "চঙ-থি" অনুষ্ঠান। "চঙ-থি" অর্থাৎ বাড়ি পালটানোর উৎসব। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন, এক জীবনে মানুষের অস্তিত্ব শেষ হয় না। জন্মান্তরের ধারাবাহিক পথ ধরে একদিন মানবসত্তার নির্বাণলাভ হতে পারে।

সুতরাং মৃত্যুর পর নিয়মমাফিক পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গেই সব স্মৃতি ধুয়েমুছে যায় না। পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ কিংবা ছয় বৎসর পর এই "চঙ-থি" অনুষ্ঠান। এমনিতে বছরে দুবার কলকাতার চীনারা মৃতদের স্মরণ করে উৎসব পালন করেন। কিন্তু "চঙ-থি" অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব হচ্ছে, এদিন মৃত পূর্বপুরুষটি নতুনভাবে কোথাও জন্মগ্রহণ করবেন। অর্থাৎ এ জীবনের সীমানা পেরিয়ে আর-একটি নতুন জীবনে তিনি প্রবেশ করবেন। বাড়ি অর্থাৎ জীবন। এক বাড়ি ছেড়ে আর-এক বাড়িতে অধিষ্ঠান। মানবজীবনে এ বড়ো সুখের মুহূর্ত। এই আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারার মতো সৌভাগ্য বুঝি আর কিছুতে নেই।

বেলেঘাটার কোল ঘেঁষে চীনাদের যে সমাধি-ক্ষেত্রটি রয়েছে, সেখানেই কিম-এর ঠাকুরদাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। আজকে সেই কবর খুঁড়ে মৃতদেহর হাড়গোড় বের করে আনা হল। কবরখানায় একদল লোক থাকেন, যাদের জীবিকা হচ্ছে এ ধরনের কাজ নিয়মিত করে যাওয়া।

তারপর হাড়গুলিকে ধোওয়া হল মদ আর সবুজ চা দিয়ে। পরিচ্ছন্ন অস্থিখণ্ডগুলিকে এবার ঢোকানো হল একটি বড়োমতো মাটির পাত্রে। অনেকটা জালার মতো দেখতে এই পাত্রটি।

কিম-এর পরিবারের সবাই আজ উপস্থিত। কবরখানার এক প্রান্তে তৈরি হয়েছে মু-ফুন বা স্মৃতিস্তম্ভ। তার সামনে চাতালমতো জায়গায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য।

সকাল থেকেই আকাশে ঘন মেঘ। দু-চার ফোঁটা করে বৃষ্টি হচ্ছে। অনুষ্ঠানে যাতে বিঘ্ন না হয়, সেজন্য মাথার ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খাদ্যদ্রব্যর মধ্যে রয়েছে পাঁচ কাপ মদ, পাঁচ কাপ সবুজ চা। বিস্কুট। মুসুম্বি আপেল। দু আঁটি ছোটো করে কাটা আখের টুকরো। ফ্রায়েড ভেটকি মাছ। গোটা-গোটা চিকেন। রান্না-করা।

একটা বড়ো বস্তার সাইজের লাল রঙের থলিতে রাখা আছে চাল আর খুচরো পয়সা। অনুষ্ঠানশেষে তা আত্মীয়-পরিজন-প্রতিবেশীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

লম্বা-লম্বা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য ধূপকাঠির থেকে বেশ মোটা। লম্বায় আড়াই ফুট-তিন ফুট তো হবেই। বড়ো-বড়ো চীনা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির গায়ে ড্রাগনের ছবি, ফুলের ছবি। ক্রিশমাসের ফারগাছের মতো এক ধরনের উদ্ভিদও রাখা আছে।

এক পাশে বড়ো-বড়ো কাগজের বাক্স। সোনালি রঙের। তার ওপর লালের ছোপ। এই বাক্সগুলিকে বলা হয় "ই-শিয়ং"। এর মধ্যে থাকে পূর্বপুরুষের জন্য ভালোবাসা- ও শুভেচ্ছা-মাখা উপহার। কাগজের তৈরি টাকা। তার ওপর মান্দারিন ভাষায় লেখা "স্বর্গের ব্যাংকে"র ছাপ। এরকম নকল টাকা কিনতে পাওয়া যায়। উপহারের মধ্যে আর থাকে কাগজের তৈরি জামাকাপড়, ছাতা, ঘড়ি। খাওয়ার জন্য চপস্টিক। ফল।

সামনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এগারোটা লাল রঙের লণ্ঠন। কিম-এর ঠাকুরদার বংশে এখন এগারো জন পুরুষ জীবিত। এই বংশধরদের সকলেরই আজ এখানে উপস্থিত থাকা রীতি।

মু-ফুন বা স্মৃতিস্তম্ভের পেছন দিকে একটি বেদীর মধ্যে গর্তমতো করা হয়েছে। এর মধ্যে অস্থিবোঝাই মাটির জালাটা নতুন করে সমাধিস্থ হবে।

পাশে দাঁড় করানো আছে কাগজে তৈরি রঙিন বেশ বড়ো আকারের একটি কাগজের বাড়ি। বাড়ির গায়ে মাঝামাঝি জায়গায় কিম-এর ঠাকুরদার একটি ফটো সাঁটানো আছে।

পুরোহিত পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। কিমরা সবাই চুপচাপ সেই পাঠ শুনছে। মাথার ওপরে ত্রিপলের শরীরে ঝিপঝিপ করে বৃষ্টিপতনের শব্দ।

চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে কিমের একটা আশ্চর্য অনুভূতি বোধ হচ্ছিল। সে যেন একা দাঁড়িয়ে আছে একটা নির্জন প্রাচীন মাঠের মধ্যে। কানের পরদায় ধ্বনিত হচ্ছে পুরোহিতের অসাধারণ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। জন্মজন্মান্তরব্যাপী জীবনের ধারাবাহিকতার রহস্যময় গ্রন্থিসূত্র। নিষ্ফল মায়া ও মোহে পূর্ণ এক-একটা খণ্ড-খণ্ড জীবন। একটা ভ্রমণকাহিনীর মতো। এক-একটা দেশ দেখে বেড়ানো। পাপপুণ্যময় অভিজ্ঞতায় ভরে ওঠে ঝুলি। ক্লান্ত ও আচ্ছন্ন অবস্থায় কিমের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বৃদ্ধ ঠাকুরদার সঙ্গে ছোটোবেলা থেকে অন্তরঙ্গ মেলামেশার টুকরো-টুকরো দৃশ্য। স্বপ্নের মতো। লতাপাতা, ফুলফলপাখি এবং গাছপালা—সকলেই বড়ো বেশি রকম জীবিত সেইসব দৃশ্যগুলিতে।

প্রার্থনাপর্ব শেষ হলে 'মু-ফুন'র পেছন দিকে বেদীর মধ্যে গর্তে সেই অস্থিসঞ্চিত মাটির জালাটি স্থাপন করা হল। উপহারের প্যাকেট "ই-শিয়ং"-গুলি দেওয়া হল সেখানে। তারপর পরিবারের পুরুষ-সদস্যরা এক মুঠো করে লালমাটি দিলেন সেই গর্তে। সব ধর্মীয় বিধি পালন হয়ে গেলে সিমেনট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল।

বেদীর একপাশে খানিকটা জায়গা খালি রেখে দেওয়া হয়েছে। কিম-এর ঠাকুমা মারা গেলে তাঁর হাড়গুলিও একই রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রেখে দেওয়া হবে স্বামীর পাশে। কিম ভাবে, অন্য জন্মে কি একই ঠাকুমা এই ঠাকুরদার বউ হবেন?

এবার কাগজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। চীনদেশের ঐতিহ্যময় প্যাটার্নের রঙিন কাগজের বাড়ি আগুনের অবোধ চাঞ্চল্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিমের ছোটো ভাই কং-ইয়ং বাজিপটকায় আগুন লাগিয়ে দিল। তাদের ঠাকুরদার এ জন্মের সব স্মৃতি পুড়িয়ে দেওয়া হল। নতুন বাড়িতে তিনি পা রেখেছেন। তিনি সুখী হোন। এ শুভেচ্ছা জানিয়ে আনন্দ-উৎসবের শরিক হয়েছে সবাই। বাজিপটকার

আওয়াজে শান্ত সমাধিক্ষেত্র সচকিত হয়ে উঠল। কিম-এর চোখের সামনে ভেসে উঠল ঠাকুরদার মৃত্যুর পর কবর দেওয়ার দিনের দৃশ্য। ছ বছর আগের কথা। কাঠের কফিনের মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল মৃতদেহ। কফিনের ডালা বন্ধ করে প্রত্যেক পুরুষ বংশধর একটি করে পেরেক মারছিল ডালার কিনারা ঘেঁষে। সেদিন চোখে জল এসেছিল কিমের। আজ কিন্তু বড়ো আনন্দের দিন।

সেই বড়ো লাল থলি থেকে একমুঠো চাল আর একমুঠো পয়সা ছোটো-ছোটো থলিতে ভর্তি করা হল। পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়-স্বজন সকলকে উপহার দেওয়া হল এক-একটি থলি। প্রত্যেকেই নিজের-নিজের বাড়িতে যত্ন করে রেখে দেবে সেই চাল আর পয়সাভর্তি থলি। ওই থলি হচ্ছে প্রচুর অর্থ আর প্রচুর খাদ্যের প্রতীক।

অনুষ্ঠানের শেষে পরিবারের পুরুষ-সদস্যরা হাতে তুলে নিল একটি করে লণ্ঠন আর একটি করে লম্বা ধূপবাতি। মেজোকাকার ছেলে কানাডায় থাকে। আসতে পারে নি। তার বদলে মেজোকাকিমাই হাতে নিল লণ্ঠন আর ধূপবাতি।

সবাই মিলে শোভাযাত্রা করে সমাধিক্ষেত্রের বাইরে এসে গাড়িতে চাপল। ঈস্টার্ন বাইপাস দিয়ে তারা দ্রুত চলে এল ট্যাংরায়।

দুর্গের মতো এক-একটা বাড়ি। লম্বালম্বা দেওয়াল। সেই অনুযায়ী বিশাল গেট। এক-একটা বাড়িতে ট্যানারির কাজকর্ম চলে। একতলায় ছড়ানো প্রশস্ত মেঝে। একদিকে চামড়াকে নানাবিধ উপায়ে 'ট্যান' করা হচ্ছে। অন্যদিকে টেবিলের পাশে চেয়ার পাতা। এখানে ছেলে মেয়ে পড়াশুনো করে। পরিবারের খাওয়াদাওয়া হয়। গল্পগুজব হয়। ওপাশে কিচেন।

দরজা খুলে গেল। গাড়িগুলো ঢুকে গেল সেই বাড়ির মধ্যে। কিমদের মতো অনেকেই দোতলায় নিজেরাও বসবাস করে।

গাড়ি থেকে নেমে কিছু লোকায়ত প্রথা পালন করার পর লণ্ঠনগুলি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তিন দিন ধরে ঝুলবে ওই জ্বলন্ত লণ্ঠনগুলি। কিমের ঠাকুরদার পরবর্তী জীবনকে আলোকিত করবে।

সন্ধেবেলায় খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। বন্ধু-বান্ধব পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের একত্র সমাবেশ। কিমের বাবার বন্ধুর রেস্টুরেনট আছে পার্ক স্ট্রীট এলাকায়। তিনিই দায়িত্ব নিয়েছেন কেটারিঙের।

খেতে বসে নানারকম সুখ-দুঃখের গল্প। কিমের মামা থাকেন বউবাজারের চায়না টাউনে। তিনি ভগ্নীপতিকে বললেন, 'তোমাদের বাপু রাস্তাঘাট আর ঠিক হল না এত কালেও। সি. এম. ডি. এ., ঈস্টার্ন বাইপাস—কত কিছু শুনছি। শুধু তোমাদের এলাকাটারই কোনো উন্নতি হল না।'

হতাশ গলায় কিমের বাবা বললেন, 'কর্পোরেশনকে হাজার বার জানানো হয়েছে। দিন-দিন ট্যাক্স বাড়িয়ে যাচ্ছে। কত জনকে ঘুষ দিতে হচ্ছে। অথচ আমাদের একটু নাগরিক সাচ্ছন্দ্য দেবার কথা কারুর মনে থাকে না।'

সহানুভূতির সুরে কিমের মামা বললেন, 'তোমরা নিজেরাই পয়সা খরচ করে রাস্তা পাকা করে নাও না কেন? এরকম ভাঙাচোরা রাস্তায় গাড়ি চালাতেও ভয় লাগে। মাঝে-মাঝেই বড়ো-বড়ো গর্ত। বর্ষাকালে তো এদিকে আসব ভাবতেই পারি না।'

কিমের ছোটোকাকা বললেন, 'সে চেষ্টা আমরা করি নি নাকি? নিজেরা সারাতে গেলেও কর্পোরেশন বাধা দিয়েছে। বলেছে, রাস্তা সরকারি সম্পত্তি। তোমরা খবদ্দার ওসব মেরামতিতে হাত দেবে না।'

'আইনমাফিক আমরা কলকাতার সিটিজেন, কিন্তু সত্যিকারের কেউ তো আমাদের এখানকার নাগরিক ভাবে না।' স্বল্পভাষী কিমের মা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন।

'কিমের ঠাকুরদা কিন্তু খুব ভাগ্যবান মানুষ।' আলোচনার প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্যই বোধহয় কিমের মাসি বললেন, 'কী পবিত্র যোগাযোগ। তাঁর মৃত্যুর সময়টাতেই তাইওয়ান থেকে আটজন পুরোহিত এসে-ছিলেন এদেশে। তাঁরাই পরিচালনা করেছিলেন পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম।'

সবাই মৃদু কণ্ঠে আলোচনা করতে থাকল কিমের ঠাকুরদার পরম সৌভাগ্যের কথা।

কিমের মাসি বললেন, 'আপনার মাকে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েও তো বাবার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে এসেছেন।'

একটু গর্বিত গলায় কিমের বাবা বললেন, 'হুঁ। মেনল্যানড চীনে। কুয়াঙটুঙ রাজ্যের ময় ইয়াঙ গ্রামে। সেখান থেকে দেড়শো বছর আগে আমার পূর্বপুরুষ এসেছিলেন কলকাতায়।'

গলা নামিয়ে গোপন কথা বলার ঢঙে কিমের মামা বললেন, 'চীনে যাবার পাসপোর্ট যোগাড় করলে কী ভাবে? অনেক দিন ধরে জিজ্ঞেস করব ভাবি, তারপর ভুলে যাই।'

কৌতুকের দৃষ্টিতে শ্যালকের দিকে তাকিয়ে কিমের বাবা বললেন, 'দিন-রাত্তির পিগারির ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাক। দেশ-দুনিয়ার কিছু খবরই রাখ না। মাকে নিয়ে হংকং চলে গেলাম এখান থেকে পাসপোর্ট করে। তারপর ওখান থেকে পারমিট নিয়ে মেনল্যানডে।'

কিমের মাসি বললেন, 'সত্যি, চীনে যাওয়া যে কী ঝকমারি আমাদের পক্ষে। এখানকার সরকার আমাদের এতটুকু মানুষ জ্ঞান করে না।'

কিমের মামা বললেন, 'চীনদেশটা কোনোদিন আর এ জন্মে দেখা হল না। মাঝে-মাঝে ভাবি, কী বা এসে গেল তাতে। বৌদ্ধধর্ম তো এদেশ থেকেই চীনে গেছল। অথচ এদেশে বৌদ্ধধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছি আমরাই।'

চারপাশে এত কিছু কথাবার্তা আলোচনার টুকরো-টুকরো অংশ কিমের কানে ঢুকছিল। সব-কিছু ভালোভাবে বোঝবার চেষ্টা সে করছিল না। মি-লিন তিন মাস হল চলে গেছে কানাডায়। একটা-মাত্র চিঠি দিয়েছিল। তারপর আর কোনো উত্তর আসে নি। মেয়েমানুষের মন এত রহস্যময়ভাবে দ্রুত পালটে যায় কিভাবে, বুঝতে পারে না কিম। কোনো সচ্ছল বেগবান জীবনের অভিজ্ঞতা কি এত দুরন্ত এনে দিতে পারে দুজন খুব কাছের মানুষ-মানুষীর সম্পর্কের মধ্যে?

অন্যমনস্ক কিমের কানের পাশে ফিশফিশ করে বন্ধু আ-পক বলল, 'অমিতাভ বচ্চনের ভিডিও ক্যাসেট এনেছি। চলো, ওপরে গিয়ে দেখি···'

তিন

অন্ধকারে চারপাশে কম্পিত বিষাদ। স্বপ্নের মধ্যে এক ত্রিশিরা কাচের আয়নায় বিন্দু-বিন্দু জলকণা ছিটকে পড়ে। প্রতিচ্ছবি বিকৃত হয়। তবু বুঝি বারবার দেখেও সাধ মেটে না। কিমের বুক কাঁপে। চোখের পাতা কাঁপে। এই শরীর, এই সুঠাম মজবুত যুবকের দেহ সব কিছু কি একদিন কোনো নির্দিষ্ট মৃত্তিকার গভীরে উইপোকা, পিঁপড়ে কিংবা উদ্ভিদের খাদ্য হবে?···

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার পর কিছু ভালো লাগছিল না কিমের। কাল সারা বিকেল ওরিজিন্যাল চীনা মান্দারিন ভাষায় 'লাস্ট এম্পারার' সিনেমাটা ভি. সি. আর.-এ দেখছিল। হংকং থেকে পিসতুতো ভাই ক্যাসেটগুলো নিয়ে এসেছে। আট ঘণ্টার ছবি। অর্ধেকটা দেখার পর চোখে খুব ব্যথা লাগছিল। নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। আধো-ঘুম আধো-চেতনায় হঠাৎ মনে হল—কে যেন দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। কেউ বাইরে এসেছে। ডাকছে।

এখন আবার কে আসতে পারে?···বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকায় কিম। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না কিমের। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল, রাত এগারোটা বাজছে। নববর্ষের অনুষ্ঠান শুরু হতে এখনো দেরি আছে। এত তাড়াতাড়ি

কেউ এসে বিরক্ত করবে বলে তো মনে হয় না।

ভাবনার ঢেউগুলো খেলা করে যায় কিমের ক্লান্ত মস্তিষ্কের কোষে-কোষে। অবসন্ন দেহ নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে হতাশ হয়। কেউ নেই। সামনের সরু প্যাসেজটা একেবারে শূন্য। এপাশে সাজানো গৌতম বুদ্ধর প্রতিমায় রঙিন আলো জ্বলছে। বুদ্ধর ঠোঁটের প্রশান্ত হাসি বিচলিত করে কিমকে।

কী বিপদ, এতক্ষণ ডাকাডাকি করেও একটু অপেক্ষা করতে পারল না লোকটা। ঘরে ঢোকবার আগে নীচের সিঁড়ি থেকে পায়ের শব্দ পেয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল কিম। দেখা যাক, সে লোকটা আবার ফিরে আসে কিনা। হতাশ হল সে। শিলং থেকে আসা ছোটো কাকিমা। ওখানে ওদের রেস্টুরেনট আছে।

কিম শুধাল, 'নীচে কাউকে নেমে যেতে দেখলে?'

রসিকতার ভঙ্গিতে চোখ ছুটো গোল-গোল করে ছোটো কাকিমা বললেন, 'উঁহু, কাউকে তো দেখলাম না। কী ব্যাপার বলো তো?'

'না তেমন কিছু না। খানিক আগে দরজায় কে ধাক্কা দিল। দরজা খুলে দেখছি, কেউ নেই।'

'দরজায় ধাক্কা দিল, অথচ তক্ষুনি দরজা খুলে দেখলে—সব ফরসা!'

'ঠিক তক্ষুনি বলা যায় না—মানে খানিকটা দেরি হয়ে গেছল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তো…'

ফিক করে হেসে ফেললেন ছোটো কাকিমা, 'ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলে বোধহয়। কোনো মেয়েছেলের পাল্লায় পড় নি তো? তোমরা বাবা কলকাতার ছেলে। কো-এডুকেশন কলেজে পড়ছ। দেখব হয়তো ভবানীপুরের কোনো মেয়ের সঙ্গে মালাবদল করছ!'

দূর, কী কথার কী উত্তর। ছোটো কাকিমাটা এত ফাজিল। সব সময় ঠাট্টা-রসিকতা। কোনো ব্যাপার সিরিয়াসলি নেয় না।

রাগ করে দুমদুম করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল কিম। ছোটোরা এখন আসন্ন মধ্যরাত্রির নববর্ষ অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে রীতিমতো উত্তেজিত। ড্রাগনের মুখোশগুলো কিছুদিন ধরে তারা তৈরি করেছে। কিমও খুব ভালো মুখোশ তৈরি করতে পারে। ছেলেবেলা থেকে করে আসছে। প্রথমে মাটি দিয়ে কাঠামোটা গড়ে নেয়। তারপর কাগজের মণ্ড লাগায়। সবশেষে রঙিন কাগজ দিয়ে ড্রাগনের মুখোশটা জীবন্ত করে তোলে নিজের হাতে।

এক বছর হল মি-লিন কানাডায় চলে গেছে। এর মধ্যে আর কোদো যোগাযোগ রাখে নি। সত্যিই কি সেখানে সে কোনো রূপকথার রাজপ্রাসাদের সন্ধান পেয়ে গেছে এতদিনে?

হঠাৎ মি-লিনের কথা মনে হতে চমকে ওঠে কিম। মি-লিন নয় তো? নিশ্চয়ই সে দরজাটা ধাক্কা দিচ্ছিল। হ্যাঁ, সে মেয়েই হতে পারে। সবকিছুতেই তার তাড়াহুড়ো। এতটুকু ধৈর্য বলে কিছু নেই। কিন্তু একটু অপেক্ষাও করতে পারল না। একসঙ্গে যেন রাজ্যের হাহাকার বেজে ওঠে কিমের মনের মধ্যে। কী কাণ্ড দেখো, আজকে হয়তো সত্যিসত্যিই কানাডা থেকে মি-লিন এসেছিল তার কাছে, কিন্তু সে টেরও পেল না।

চীনাপাড়ায় সর্বত্র এই জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের ঠাণ্ডার মধ্যেও নববর্ষ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। চীনা পঞ্জিকা অনুযায়ী কোনো বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমে, কোনো বছর জানুয়ারির শেষে এ উৎসব হয়। লিপ-ইয়ার থাকলে ফেবরুয়ারির মাঝামাঝি। নানারকম নামে তারা ডাকে এই নববর্ষের অনুষ্ঠানটিকে। কেউ বলে "কো-নিয়ান", কেউ বলে "সিং-ইয়ান"।

নববর্ষ উদ্‌যাপনের সময়ও প্রতি বছর আলাদা-আলাদা। এ বছর রাত দেড়টায় শুরু হবে।

হাঁটতে-হাঁটতে ময় কুয়াঙ চাইনিজ হাইস্কুলের কাছে এল কিম। স্কুলের পাশেই "চুং-ই-থঙ"। একটি

ক্লাব। সেই সঙ্গে একটি মন্দিরও আছে। ক্লাবে কিমের বন্ধুরা বসে গল্প করছিল। ওকে দেখে হইচই করে স্বাগত জানাল। এখানে ওরা "হাক্কা" ভাষাতেই কথা বলছিল। বাঙলা ভাষায় যেমন বরিশাল, শিলেট, চাটগাঁ কিংবা শান্তিপুরের মধ্যে পার্থক্য আছে, সে রকম কলকাতার চীনারাও নানারকম আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন। যেমন কিমদের হাক্কা ছাড়াও অন্যান্য যেসব ভাষা ওদের মধ্যে অঞ্চলভেদে প্রচলিত—ক্যানটোজ, ফুকিয়েন, ফুপে প্রভৃতি।

সাধারণভাবে সব চীনারা কিন্তু তাদের জাতীয় ভাষা "মান্দারিন" শেখে। ওই ভাষাতেই তারা লেখা-পড়ার কাজ চালায়।

ক্লাবঘরে এক কোণে বসে কিমের বন্ধু নিয়াং-ফা তাদের দৈনিক সংবাদপত্র "ইন থু নিয়ে পাও" পড়ছিল। ভাবলে অবাক লাগে, এই কলকাতায় রোজ চীনা "মান্দারিন" ভাষায় ছুটি দৈনিক সংবাদ-পত্র বের হয়। অন্য সংবাদপত্রটির নাম "ইন থু সং পাও"।

বন্ধুর কাছ থেকে খবরের কাগজটা নিয়ে উলটে-পালটে দেখল কিম। বড়ো বেশি নিঃসঙ্গ লাগছে নিজেকে। মি-লিনের কথাটা বছর খানেক বাদে কেন এই নববর্ষের মধ্যরাত্রিরে মনে পড়ল। এই শীতলতম যামিনীতে মস্তিষ্কের কোষে-কোষে আলোড়নকারী কোনো ধ্বনিপুঞ্জ এত বেদনা জাগায় কেন? সত্যি-সত্যি দরজায় ধাক্কা দিয়ে কেউ তাকে ঘুম থেকে তুলে ডাকতে চেয়েছিল? সাড়া না পেয়ে অভিমানে ফিরে চলে গেছে?

চীনা ভাষায় ড্রাগনের নাম "সির থেউ"। ড্রাগন হচ্ছে সৌভাগ্যের প্রতীক। কিম এবং তাদের দলের সব অল্পবয়সী ছেলেরা মাথায় পরে নিল নিজেদের তৈরি ড্রাগনের মুখোশ। রাত দেড়টা বেজে গেছে। বাজিপটকা ফাটতে শুরু করেছে। ভেনাস অরকেস্ট্রা পার্টি বাজাতে শুরু করেছে উচ্চগ্রামের বাজনা।

মহল্লায় সর্বত্র সরগরম। শব্দ কোলাহল বাজির আওয়াজ আর ব্যানড পার্টির বাজনার তালে-তালে নাচতে থাকে মুখোশধারী কিমেরা। প্রত্যেকের বাড়ির মধ্যে গিয়ে তারা নাচে। গৃহস্বামী কিছু খেতে দেন। তারপর আর-এক বাড়ি। এভাবে চলবে বেলা দুপুর পর্যন্ত।

ভোর হয়ে আসছে। সূর্যের আলোয় আরো ঝলমল করছে নববর্ষের চীনাপাড়া। নাচতে-নাচতে হঠাৎ কিমের চোখে পড়ে যায় এপাশে দরজার দিকে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী মেয়ের মুখ। বুকের ভেতরটা কেমন শিউরে ওঠে। ও কি মি-লিন? না কি ফি-চেন? অনেকক্ষণ মুখোশ পরে লাফঝাঁপ করে কিমের ক্লান্ত চোখ ছুটো ব্যথায় টনটন করে। মুখোশের মধ্যে দিয়ে দেখতে কষ্ট বোধ হয়। মেয়েটা কে সে ঠিক চিনে উঠতে পারে না। আর্তকণ্ঠে সে ডাকতে থাকে নাম ধরে। এক প্রসারমাণ প্রাচীন প্রতিধ্বনির মধ্যে তার কণ্ঠস্বর ক্রমশ মিলেমিশে যায়।

তথ্যসংগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা :

১. আমার কলকাতার চীনা বন্ধুরা, বিশেষ করে তরুণ বন্ধু কিম ফান কং।

২. Chinese in Calcutta by Dr. Hasan Ali (দ্র. Aspects of Society and Culture in Calcutta, Ed. M. K. A. Siddiqui. Anthropological Survey of India, 1982)

বিনয়কুমার সরকারের শিল্পদৃষ্টি

সত্যজিৎ চৌধুরী

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের শিল্পদৃষ্টির তাৎপর্য বোঝার জন্য আমাদের দেশে আধুনিক শিল্পের বিকাশের স্তরগুলির রূপরেখা মনে রাখতে হয়। শিল্পের সমস্যা নিয়ে আলোচনা সৃজনধারার অনুগামী। শিল্পকাজের বাস্তব জমি থেকে বিচ্ছিন্ন নিরালম্ব নন্দনতত্ত্বে অধ্যাপক সরকারের আগ্রহ ছিল না। তাঁর সব লেখাতেই তাই প্রচুর উদাহরণ সামনে রেখে বিচারে এগোতেন। "জানোই তো আমি কট্টর বস্তুনিষ্ঠ জরিপের পেশাদার"—তাঁর এই উক্তি শিল্প নিয়ে যাবতীয় লেখা সম্পর্কেও সমান খাটে।

ভারতীয় কলাসংস্কৃতির আধুনিক বিকাশ কোথা থেকে শুরু এ প্রশ্ন গোড়াতেই ওঠে। অধ্যাপক সরকার কোনো পূর্ণাঙ্গ শিল্প-ইতিহাস দাঁড় করান নি। রবি বর্মা (১৮৪৮-১৯০৬) থেকে, না অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) থেকে আমাদের আধুনিক শিল্পের সূচনা এ নিয়ে তর্ক আছে। বিনয় সরকার মশায় এ তর্কে যান নি, তবে আনুষঙ্গিক মন্তব্য থেকে ধরা যায় অবনীন্দ্রনাথকেই তিনি প্রথম যথার্থ আধুনিক শিল্পী মনে করতেন। তাঁর ঝোঁক "বঙ্গ-বিপ্লবে"র দিক থেকে আধুনিক ইতিহাসের পর্বগুলো বিন্যস্ত করা। অন্তত শিল্পের এলাকায় এই ঝোঁকে কিছু ভ্রষ্টতা অশীয় না, কারণ, আধুনিক শিল্পের অভ্যুদয় এবং বিকিরণ বাংলা থেকেই। অবনীন্দ্র-মণ্ডলের শিল্পীরা ভারতবর্ষের আধুনিক কলাকেন্দ্র-গুলির মাথায় বসেছিলেন, দীর্ঘদিন এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ তাঁদেরই হাতে ছিল।

অবনীন্দ্রনাথের ঠিক আগে রবি বর্মার সমাদর প্রায় সর্বব্যাপী ছিল। ইংরেজ শিল্পী থিওডোর জেন্‌সনের ছাত্র রবি বর্মা তেলরঙ ভালো আয়ত্ত করেছিলেন। ভারতে এ আঙ্গিক নতুন। ভারতীয় আলোর প্রখরতায় তেলরঙ চলে না—এ ধারণা ভাঙে রবি বর্মার কাজে। প্রথমে প্রতিকৃতি আঁকতেন। তাতে উঁচু মহলে প্রতিষ্ঠা আসে। পরে সাধারণ মানুষের ঘরে-ঘরে পৌঁছন পৌরাণিক বিষয় নিয়ে

সোশিও-ইকনমিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়োজিত বিনয়কুমার সরকার জন্মশতবার্ষিকী আলোচনাচক্রে (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২) পঠিত নিবন্ধ।

আঁকা ছবির ওলিওগ্রাফ প্রিন্টের মাধ্যমে। এসব ছবির ঠাট পুরো বিদেশী, বিষয়টা পৌরাণিক, উপস্থাপনা খুব নাটুকে। আজ সব মিলিয়ে মনে হয় কিছু-কিছু য়ুরোপীয় ছবির ছাপা কপির প্রভাব এবং য়ুরোপ থেকে এদেশে আসতেন যেসব ভ্রাম্যমাণ শিল্পী তাঁদের কাজের নমুনার প্রভাবে জাগা এক রুচির চাহিদা রবি বর্মা ভালোই মিটিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাদের কলাসংস্কৃতির আধুনিকতায় মূল সমস্যার জায়গাটা কোথায়—এই বিচারের মুখে অবনীন্দ্রনাথই প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন, রবি বর্মা নয়। অবনীন্দ্রনাথেরও শিক্ষা বিদেশী গুরুর কাছে, ইতালীয় গিলার্দি এবং ইংরেজ পামার তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তেলরঙ তাঁকে টানে নি, তেলরঙের বিকল্প প্যাস্টেল ব্যবহারে অসামান্য দক্ষতা তাঁর আয়ত্তে আসে। আর পামারের কাছে শেখা জলরঙের আঙ্গিক জাপানি শিল্পী ইয়োকো-ইয়ামা তাইকান ও হিশিদা শুন্‌সোর কাজের দৃষ্টান্তে রূপান্তরিত করে এক অব্যর্থ মাধ্যম উদ্ভাবন করেন, যা অবনীন্দ্র-ওয়াশ পদ্ধতি নামে এখন প্রসিদ্ধ। অবনীন্দ্র-শৈলীর উপাদানবিচারে আর দুটি তথ্য স্মরণ হবে। তাঁর ছোটো দাদামশাই নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বান্ধবী মার্টিনডেলের কাছ থেকে পাওয়া আইরিশ ইলিউমিনেশনের কাজ এবং ভগ্নীপতি শেষেন্দ্রনাথের উপহার দিল্লিকলমের কাজের একটি অ্যালবাম নিজস্ব আঙ্গিকের সংগঠনে তাঁকে গভীর প্রভাবিত করে। এইসব উপাদান, সন্দেহ নেই দেশী এবং বিদেশী দুই উপাদানই—সমান গুরুত্বে নিজের কাজে মেলানোয় তাঁর নিবিষ্ট অধ্যবসায় অনেক বড়ো তাৎপর্য পেল "বঙ্গ-বিপ্লবের" উদ্দীপনায়। এই কালে ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে শিল্পে স্বাদেশিকতার তাত্ত্বিক আন্দোলন জেগে ওঠে, যার জের চলেছিল দুই দশক জুড়ে। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন হ্যাভেল, কুমারস্বামী, নিবেদিতা, অর বন্দ ঘোষ এবং আরও অনেক। এই প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ বড়ো দায়িত্ব নিলেন নিজের উপরে। গুরুর আসনে বসলেন। নিজের কাজের সঙ্গে-সঙ্গে একদল তরুণকে শিল্পের পথে চালনা করলেন। অন্যদিকে তত্ত্বমূলক রচনা-ধারায় ভারতীয় আধুনিক শিল্পীর লক্ষ্য স্থির করে দেবার জন্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্পর্ক নিয়ে নানা প্রশ্ন তুললেন, বিচার করলেন।

শিক্ষিত ভদ্রসাধারণের স্বদেশজিজ্ঞাসার আবেগের তাপে আধুনিক শিল্পের উন্মেষ। অবনীন্দ্র-মণ্ডলীর শিল্পীরা এই নতুন কলাসংস্কৃতির ধারাটি পুষ্ট করে সারা ভারতে চারিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গের উদ্দীপনা কেটে গেল। ভাঙা বাংলা জোড়াও লাগল (১৯১১)। এই আন্দোলনের মাঝ থেকে স্বদেশভাবনার, স্বাদেশিকতার একটা মডেল যেন উঠে এসে প্রায় স্থায়ী হয়ে বসল। অন্তত শিল্পের এলাকায় একটা ছক অনড় মর্যাদা পাচ্ছিল। শিল্পে স্বাদেশিকতার আন্দোলন এক অবাস্তব আধ্যাত্মিকতার ঝোঁক এনে দিল। ছবির বিষয় হবে পৌরাণিক, ছবিতে ফুটবে তুরীয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি—এই ধারণা অনেকটাই হ্যাভেল-নিবেদিতা-কুমারস্বামীর লালন-সমর্থন পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল বসুর মতো প্রখর প্রতিভার আত্মবিকাশে এই ছকের প্রভাব টেকে নি, কিন্তু সাধারণভাবে ওই একই ছকের মধ্যে কাজ করে সহজে প্রতিষ্ঠা পাবার মোহে বহু শিল্পীই মজেছেন। ইন্‌ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর ছত্রছায়ায় এ ধারাটার চর্চা চলেছে দীর্ঘ দিন।

১৯২০-র মুখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ছক ভাঙার উদ্যোগ নিলেন। নন্দলালকে সোসাইটি থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলেন। কলাভবনে স্বাধীন পরীক্ষামূলক কাজের অবাধ সুযোগ দিলেন। স্তেল্লা ক্রাম্‌রিশকে দিয়ে য়ুরোপীয় শিল্পের আধুনিক কাল অবধি বিবর্তনের ইতিহাস পড়াবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, আমাদের আধুনিক শিল্পকলা স্বাদেশিকতার মোহে এক বন্ধ্যা জমিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯২৬-এ "আর্ট অ্যান্ড ট্রাডিশন" নামে এক প্রবন্ধে শিল্পীসমাজের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট আহ্বান

জানালেন, দাগানো পশুর মতো একই খোয়াড়ে ঢোকানোর চেষ্টা আপনারা প্রতিরোধ করুন। স্মরণ করার মতো আর-একটি তাৎপর্যময় ঘটনা, রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই কলকাতায় ১৯২২-এ য়ুরোপের সমকালীন এক্‌স্‌প্রেশনিস্ট আর্টিস্টদের ছবির একটি প্রদর্শনী হয়। এবং এই সঙ্গেই মনে আসে ১৯২৮ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজে ক্রমে ছবি আঁকায় গভীরভাবে নিবিষ্ট হন। তাঁর হাতের কাজে ভারতীয় আধুনিক শিল্পে যে এক কালান্তর ঘটে গেছে—এই ঐতিহাসিক সত্য আজ আর তর্কের বিষয় নয়।

পুরাণের, আধ্যাত্মিকতার ঘোর কাটিয়ে শিল্পের শুদ্ধতার প্রতিষ্ঠাভূমি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করে দিলেন। এই শিল্পমুক্তির পথেই উত্তরকালে ১৯৪০-এর শিল্পীদের হাতের কাজে ভারতীয় শিল্প আধুনিক পৃথিবীর শিল্পের বড়ো রাস্তায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যামিনী রায়ের কাজ, ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের কাজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের, রামকিংকরের কাজ এই মুক্তিকেই সত্য প্রতিপন্ন করেছে। এখানে বলা দরকার, এই-যে নন্দনভাবনা এবং কাজের ধারায় ক্রমে বিচিত্র-মুখী রূপান্তর এল অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসু এই বাঁক ফেরার তাৎপর্য বুঝতেন। স্মরণ করুন, অবনীন্দ্রনাথের ১৯৩৮-৩৯-এর চণ্ডীমঙ্গল-কৃষ্ণমঙ্গল চিত্রমালার প্রথাভাঙা প্রবল আঙ্গিকের কথা, নন্দলাল বসুর প্রকৃতিচিত্র এবং সাদাকালোয় করা অজস্র ছবি ও হরিপুরা কংগ্রেসের পোস্টারগুলির কথা। এমনকি তত্ত্বগত আলোচনাতেও অবনীন্দ্রনাথ আগের যুগের ভারতীয় আদর্শের বুলি ছেড়ে শিল্পীর স্বাধীনতার কথা বলেন। পুনরুজ্জীবনবাদের কঠিন সমালোচনা করেন।

২.

এই রূপরেখায় নজর করলে দেখা যাচ্ছে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমাদের শিল্পভাবনায় একটা বড়ো বাঁক। শিল্পের মুক্তি ও প্রগতি কোন্ পথে এ-প্রশ্ন তীব্র হয়ে উঠেছে। নতুন এ-ভাবনার উৎস ছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায়। যুদ্ধের তাণ্ডবে অনেক ভাঙন সত্ত্বেও মানুষ মানুষের অনেক কাছে চলে এল। আমাদের চিন্তাভাবনায়, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এই যুগান্তরের আলোহাওয়ার অভ্যর্থনায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তামাম য়ুরোপ তিনি চষে বেড়িয়েছেন। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের ভাবনার জগৎ, সাংস্কৃতিক সৃজন-শীলতার জগৎ তাঁর সাক্ষাৎ পরিচিত ছিল। আবিশ্ব শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে মানবিক চেতনার ঐক্যের দিক-গুলি বিশ্লেষণ করা তাঁর মননের কেন্দ্রগত লক্ষ্য। নতুন আন্তর্জাতিকতার চেতনায় এই দৃষ্টি এসেছিল তাঁর মধ্যে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই শিল্পে স্বাদেশিকতার গণ্ডি-টানার যৌক্তিকতা সম্পর্কে অধ্যাপক সরকারের মনে প্রশ্ন জাগে। ১৯০৫-এর বঙ্গবিপ্লবকে তিনি বাংলার পক্ষে, ভারতের পক্ষে এক অসামান্য ঐতিহাসিক ঘটনা বিবেচনা করতেন। "বাঙালির বাচ্চা" বলে তাঁর গর্বেরও অন্ত ছিল না। কিন্তু সংকীর্ণ জাতীয়তা, শোভেন্‌ইজম তাঁর মননবৃত্তিকে খণ্ডিত করে নি। শিল্পের কীর্তিতে ভারতবর্ষ বিশ্বের পটে কোথায় দাঁড়ায় এই প্রশ্ন যখন উঠল তখন কুমারস্বামীদের মতো জাতীয়তা-অভিমানীরা আধ্যাত্মিকতার তকমা চড়িয়ে ভারতশিল্পের জন্য এক অপার্থিব মর্যাদার আসন দাবি করলেন। ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে অধ্যাপক সরকারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা "হিন্দু আর্ট : ইট্‌স হিউম্যানিজম অ্যান্ড মডার্নিজম : অ্যান ইন্‌ট্রোডাক্‌টরি এসে" (নিউ ইয়র্ক) প্রকৃতপক্ষে হ্যাভেল-নিবেদিতা-কুমারস্বামীদের আধ্যাত্মিকতা-জাতীয়তা গরবি পুনরুজ্জীবনবাদী তত্ত্বের বিরোধী দৃষ্টি থেকে লেখা। আমরা দেখেছি, ১৯২০ থেকে আমাদের দেশের মধ্যে নতুন শিল্পভাবনা আসছিল, রবীন্দ্রনাথ আর-একটি নতুন তরঙ্গ জাগিয়ে তুলবার আয়োজন

করছিলেন। এই আয়োজনের সঙ্গেই অন্তর্গত মিল ছিল অধ্যাপক সরকারের ভাবনার। ১৯২০ সালে প্রকাশিত রচনাটিতে তিনি দেখান, ভারতীয় ঐতিহ্যের শিল্পকলা অলৌকিক আধ্যাত্মিক নয়, একান্তভাবে "মানুষনিষ্ঠ" সৃষ্টি হিউম্যানিজমেই সে শিল্পের ভিত্তি। ভারতশিল্পে বাস্তব অ্যানাটমি ভাঙা হয়েছে। আধুনিক য়ুরোপেও ভাঙা হয়েছে বাস্তবের অ্যানাটমি। প্রকৃতির মাপজোক না মানায় য়ুরোপীয় শিল্প যদি অলৌকিক না হয়ে থাকে তবে ভারতশিল্পকেই-বা অলৌকিক, অপার্থিব বলা হবে কেন? এই যুক্তিধারায় অধ্যাপক সরকার প্রতিপন্ন করেন, ভারতবর্ষের শিল্পীরা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে রূপময় বিশ্বের ছাঁদটি দেখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। আবহমান ভারত-শিল্পে পার্থিবতা এবং মানবিকতারই প্রকাশ রয়েছে।

শিল্পের ভারতবর্ষ জীবন এবং জগৎকে উপেক্ষা করে নি—এই কথাটা জোরের সঙ্গে বলা তখন দরকার ছিল। কারণ আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে ভারত-শিল্পের জন্য যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করা হয়ে আসছিল তার ফল দাঁড়িয়েছিল মারাত্মক। রূপসৃষ্টির কঠিন দায় এড়িয়ে বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা অনেকেই ছবিতে রূপক আর ব্যঞ্জনা ফোটাতেন। ওয়াশের নামে তাৎপর্যহীন বর্ণমায়ার মধ্যে বস্তুপুঞ্জ বা মানুষী দেহ-ভঙ্গিগুলি এক অবাস্তব অবস্থান পেত। এই শিল্পের মহিমা ব্যাখ্যায় বাঁধাধরা শিল্পসমালোচকেরা উৎকট যুক্তি বিস্তার করতেন।

এর পরের ধাপে বিনয় সরকার মশাই প্রবল বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। মডার্ন রিভিয়্যু পত্রিকার ১৯২১-এর মে সংখ্যায় অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী ফণীন্দ্রনাথ বসুর ভাস্কর্যের এক সমালোচনা লেখেন অগস্ত্য ছদ্মনামে। য়ুরোপে শিক্ষিত শিল্পী ফণীন্দ্রনাথের কাজ সম্পর্কে উপেক্ষাভরে লেখা এই সমালোচনার সুযোগটা বিনয় সরকার মশায় নিলেন। তিনি 'রূপম' পত্রিকার ১৯২২-এর জানুয়ারি সংখ্যায় "দি ইস্‌থেটিক্‌স অব ইয়ং ইন্‌ডিয়া" নামে দীর্ঘ প্রবন্ধে অগস্ত্যর সমালোচনা উপলক্ষ করে স্বাদেশিকতাপন্থী, পুনরুজ্জীবনবাদী শিল্পতত্ত্বের দুর্গে আক্রমণ চালালেন। তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল : শিল্পের স্বরাজ বা অন্যনিরপেক্ষ স্বকীয় মূল্য অবশ্যমান্য; শিল্পের কোনো জাতীয় চরিত্র থাকতে পারে না; জাতীয় চরিত্রের দোহাই দিয়ে শিল্পীকে বিশেষ মার্কামারা সৃষ্টিতে নিয়োজিত করাও চলে না।

এই প্রবন্ধ লেখার সময়ের পরিবেশ স্মরণ করুন। ভারতীয় আধুনিক শিল্পের দ্বিতীয় তরঙ্গ জাগিয়ে তোলার আয়োজন তখন বেশ জমে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ স্তেল্লা ক্রাম্‌রিশকে দিয়ে আধুনিক য়ুরোপীয় শিল্পের ক্লাস নেওয়াচ্ছেন। তার সঙ্গে ক্রাম্‌রিশ ভারতশিল্পের ভাব-সম্পদের ব্যাখ্যার বদলে আঙ্গিকগত বিশিষ্টতা এবং উপাদান বিশ্লেষণ করে শিল্পসমালোচনায় নতুন দৃষ্টি আনেন। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে ১৯২২-এ গগনেন্দ্রনাথ এবং ক্রাম্‌রিশ কলকাতায় য়ুরোপের এক্‌স্‌প্রেশনিস্ট চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বাংলার শিল্পী-সমাজ এই প্রথম সমকালীন য়ুরোপীয় শিল্পীদের, কাণ্ডিন্‌স্কি-পল-ক্লী-র মতো শিল্পীদের কাজ দেখলেন। অগুস্ত রোদ্যাঁর ছাত্র এমিল আন্তোয়ান বুর্দেল। বুর্দেলের এক ছাত্রী শ্রীমতী মিলওয়ার্ড কলাভবনে (শান্তিনিকেতন) আধুনিক ভাস্কর্যের আঙ্গিক শেখাচ্ছেন তখন। এঁরই সামান্য সাহায্য পেয়ে রামকিংকর ভারতীয় ভাস্কর্যে এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। এসব তথ্যে প্রমাণ হয় আমাদের শিল্পচেতনায় পালাবদলের আয়োজন তখন জমে উঠছিল।

"শিল্পে স্বরাজ" বা অন্য-নিরপেক্ষ স্বকীয় মূল্যের কথা তখন এত জোর দিয়ে বলতে হয়েছিল, কারণ, প্রতিষ্ঠিত সমালোচক মহলে ভাববস্তুর বা আধ্যাত্মিক আদর্শের আবেগময় ব্যাখ্যানকে মনে করা হচ্ছিল চূড়ান্ত শিল্পসমালোচনা। এই ধারাটির শুরু হয়েছিল হ্যাভেল-নিবেদিতাদের শিল্পসমালোচনায়। বিনয়

সরকার গানের দৃষ্টান্ত তুলে বলছেন—যদি বলি বেহাগ হল মধ্যরাতের রাগিণী, বা বেহাগ পাহাড়ি নির্জনতার গভীর ব্যঞ্জনা জাগায়, কিংবা বেহাগ জাগায় বিষাদের ভাব, বিষাদের রস—এরকম বলায় কি সংগীত সম্পর্কে আদৌ কিছু বলা হয়? এ কি সংগীতের মর্ম বোঝানোর ভাষা? সে মর্ম বোঝাতে ওই রাগিণীতে ধ্বনির বিন্যাস, ধ্বনিবন্ধগুলির বুনটে গড়ে ওঠা কাঠামোটির কথায় যেতে হবে। সাহিত্যিক উচ্ছ্বাসে সংগীতের নিজস্ব এলাকার সমস্যাগুলি, বিশিষ্টতার দিকগুলি বোঝানো যায় না।

তেমনি বিষয়মহিমার বিবরণ বা ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক মহিমার মাপে শিল্পসাহিত্যের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করা যায় না। উৎকর্ষ অপকর্ষ শিল্পবস্তুটি নির্মাণের কলা-বিধির উপরেই নির্ভর করে। সেই কলাবিধির প্রয়োগ-গত বৈশিষ্ট্য আশ্রয় করে বিশেষ সৃষ্টি দাঁড়ায়। এইখানে শিল্পের স্বরাজ্য। যথার্থ শিল্পবোধের জন্য জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য, বিষয়ের মহিমা—এসব পেরিয়ে বিষয়ত্যাগী শুদ্ধ রূপের তাৎপর্য ধরতে পারার শিক্ষায় যথার্থ শিল্পদৃষ্টি অর্জন সম্ভব। আধুনিক কলাসংস্কৃতিতে এই শুদ্ধরূপের ভিতকেই শিল্পের স্বরাজ্য মনে করা হয়। সব দেশেরই শিল্পমুক্তি এই পথে। ভারতেরও। এ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিনয় সরকার বিশ্বের কিছু সেরা শিল্পের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করেছেন—ফাঁকা আপ্ত বাক্য উচ্চারণ করে দায় সারেন নি। খুবই প্রখর আক্রমণের ভঙ্গিতে লেখা এ প্রবন্ধ প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া জাগায়। অগস্ত্য এর একদফা জবাব লেখেন, সে জবাবে যুক্তি বিশেষ ছিল না, ছিল অধ্যাপক সরকারকে ব্যক্তিগত আক্রমণ। টিটকিরির মেজাজে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 'বিজলী' পত্রিকায় লেখেন "পণ্ডিতের লাগে ধন্ধ", আবার লেখেন "কচায়নের জবাব"। বিজলী-সম্পাদকের অনুরোধে প্রমথ চৌধুরী মশায় দুবার লেখেন দুটি পত্র-নিবন্ধ। এই উপলক্ষে আর-একটি গভীর বিচার পাওয়া যায় স্তেল্লা ক্রামরিশের কলম থেকে।

বিতর্কের ভেতর থেকে একটা স্পষ্ট কথা বেরিয়ে এল। জাতীয়তার মার্কাতেই শিল্পের উৎকর্ষ প্রমাণ হয় না, শিল্পের চরিতার্থতা নির্ভর করে অতিবিশিষ্ট সৃজনবিধি প্রয়োগের নৈপুণ্যের উপরে। এই কথা ঘুরে ফিরে মানা হল যে আধুনিক শিল্পের লক্ষ্য বিষয়ত্যাগী শুদ্ধরূপের অন্বেষা। প্রমথ চৌধুরীও টেরছা মন্তব্যের প্যাঁচের মধ্যে প্রকারান্তরে বিনয় সরকারের মূল কথাটা মেনে নিয়ে বললেন, 'প্রতি ওয়ার্ক অব আর্ট হচ্ছে স্বরাট্।' ক্রামরিশ দেখান, বিশেষ শিল্প-সৃষ্টি তার রূপের অনন্যতায় পূর্ণ নান্দনিক মর্যাদা অর্জন করে ঠিকই, কিন্তু সৃষ্টি ব্যাপারটি একটি সৃজন-পদ্ধতির ভেতর দিয়ে পূর্ণতা পায়। সেই পদ্ধতির মধ্যে উপাদানবস্তু দুরন্ত করতে হয় শিল্পীকে। সৃজন-বিধির এ জ্ঞান কোনো একটি সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েই অবসিত হয়ে যায় না। এক-একটা দেশের শিল্পের ধারায় এই জ্ঞান, এই বোধ কাজ করে যায়। পুরাণের গল্প দিয়ে শিল্পের জাতীয় চরিত্র নির্ণয়ের স্থূল চেষ্টা হাস্যকর, কিন্তু গভীর বোধে ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম আবহ ধরার চেষ্টাকে ক্রামরিশ মূল্য দিলেন। এই যুক্তির সমর্থন রবীন্দ্রনাথের "আর্ট অ্যান্ড ট্রাডিশন" প্রবন্ধেও মেলে। ভারতীয় মেজাজ থাকবেই এদেশের শিল্প-কাজে, কিন্তু সে হবে "অ্যান ইনার কোয়ালিটি অ্যান্ড নট অ্যান আর্টিফিসিয়ালি ফস্টার্ড ফরম্যা-লিজম; অ্যান্ড দেয়ারফোর নট টু অবট্রুসিভ্লি অভিয়াস, নর অ্যাবনরম্যালি সেল্ফ্কন্সাস।"

কালান্তরের মুখে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক সরকার নূতন শিল্পরুচিপরিপোষণপেলেন বিশেষ করে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, সুনয়নী দেবীর, রবীন্দ্রনাথের এবং যামিনী রায়ের কাজে। বেঙ্গল স্কুলের আন্দোলনের একেবারে মাঝখানে থেকেও গগনেন্দ্রনাথ আত্মস্থ পরীক্ষায় আঙ্কিকে যে বিশিষ্টতা আনেন তার সঙ্গে তুলনীয় কাজ তাঁর সমকালীন স্বদেশে ছিল না। সঙ্গতভাবেই তাঁর কাজের আস্বাদনে কিউবিজমের কথা উঠেছে। তাঁর ছবিতে আলোর ব্যবহার, উজ্জ্বল রঙের জমক য়ুরোপীয় আধুনিক শিল্পের তুলনা মনে আনে। খুব আশ্চর্য, প্রায় কেউ উল্লেখই করেন না যে সুনয়নী দেবীর কথা, অধ্যাপক সরকার তাঁর কাজের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হয়তো লোকশিল্পেই সুনয়নীর প্রেরণার উৎস। কিন্তু ছবির জমির দ্বি-মাত্রিকতাকে চূড়ান্ত মূল্য দেওয়ায় তাঁর কাজে যে বিশিষ্টতা এল—সে একান্তভাবে আবিশ্ব আধুনিক শিল্পদৃষ্টির দিক থেকেই মূল্যবান্। যামিনী রায় সম্পর্কে বিনয় সরকারের মন্তব্যকে মনে হবে নির্ভুল এবং যথার্থ। বলছেন, "আদিম বুনো পাহাড়ি গড়ন হচ্ছে যামিনী-শিল্পের অন্যতম প্রধান সওদা।" কিন্তু তা বলে যামিনী রায়কে ঢালাও মন্তব্যে পটুয়া বলা চলে না, বলেনও না অধ্যাপক সরকার। বরং সঙ্গত মন্তব্যই করেন, "সত্যিকার কথা হচ্ছে—যামিনী বেশ-কিছু পাশ্চাত্যপন্থী। যামিনী অশিক্ষিত পটুয়া-ওয়ালা লোকশিল্পী নন।" ('বিনয় সরকারের বৈঠকে', দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৪৫)। অধ্যাপক সরকার যামিনী গাঙ্গুলীর কাজকেও মূল্যবান্ মনে করেন। তাঁর প্রভাবে সরকারি আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য রীতিচর্চা অবনীন্দ্রনাথের পরে আর-একবার জেগে উঠতে পেরেছিল। যামিনী গাঙ্গুলির প্রভাব বর্তেছে অতুল বসুর কাজে, যামিনী রায়েরও কাজে।

অধ্যাপক বিনয় সরকারের কাণ্ডজ্ঞান চমকে দেয় রবীন্দ্রনাথের ছবি বিচারের সক্ষমতায়। ১৯৪১-এর জুলাই মাসে অধ্যাপক সরকার রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির সংকলন 'চিত্রলিপি'র প্রথম খণ্ডের ছবি ধরে-ধরে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ক্যালকাটা রিভিয়্যু পত্রিকায় এই প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'টেগোর দি পোয়েট অ্যাজ পেইন্টার' নামে। ১৯৪১-এ আমাদের কলা-সংস্কৃতির আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের তেমন কোনো স্বীকৃতি ছিল না। কবি ছবিও আঁকছেন, বিদেশে তার প্রশংসাও হচ্ছে—এই খবর শুধু বিস্ময় জাগাত সাংস্কৃতিক মহলে। ঘনিষ্ঠ দু-চারজন শিল্পীর, যেমন অবনীন্দ্রনাথের, নন্দলালের, যামিনী রায়ের মন্তব্য পাওয়া যায়। যামিনী রায়ের মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ খুব অভিভূত বোধ করে চিঠি লেখেন। কিন্তু আমাদের চিত্রকলার আধুনিকতা যে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের কাজ সম্পূর্ণ নতুন এক পর্বে উত্তীর্ণ হল এই চেতনা তখনও কারো লেখায় ধরা দেয় নি। এদিক থেকে বিনয়কুমার সরকারের প্রবন্ধটি অসাধারণ তাৎপর্যময়। তাঁর আলোচনা-পদ্ধতিও আমাদের সমকালীন চিত্র-সমালোচনার আবহাওয়ায় ব্যতিক্রমের নজির। ছবির ব্যঞ্জনা বা ভাববস্তু বা বিষয় নিয়ে অধ্যাপক সরকার ফেনানো আবেগ প্রকাশ করেন নি। চিত্র-লিপি অ্যালবামের প্রত্যেকটি ছবি আলাদা-আলাদা করে, তার রূপগত আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকরপ্রতিভার বিশিষ্টতা ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক সরকারের সিদ্ধান্ত, "হি ইজ ওয়ান অব দি ওয়ার্ল্ডস মোস্ট অ্যাড্ভান্স্ড মডার্নস ইন দ্য ফিয়ার অব পেইন্টিং।" বিশেষ করে তিনি দেখান, বিশ্বের আধুনিক ছবির ধারায় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসাবেই প্রতিষ্ঠা পাবার সন্দেহাতীত যোগ্যতা ধারণ করেন। তাঁর প্রতিভার অপর শক্তি নিরপেক্ষভাবে, সেসব কীর্তি বিচারে না এনেও চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই সত্য মর্যাদা চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে সে সময়ে এদেশে আর কেউ দেন নি।

রবীন্দ্রনাথের হাতের কাজের নজিরে ছবিতে বিষয়ের মহিমা খোঁজার যুগ শেষ হল। যামিনী রায়েরা তরুণ বয়সে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথেই আধুনিক নন্দনের চরিতার্থতা দেখে সাহস পেয়ে-ছিলেন, প্রত্যয়ের জমি পেয়েছিলেন। এরই মধ্যে বিশ্বে ঘনাল সভ্যতার সংকট। ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ংকর তাণ্ডব—তার প্রভাব পরোক্ষে হলেও আমাদের জীবনে এসেছে। নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে গেল বাংলাদেশ। দুর্ভিক্ষের মহামারীর সর্বনাশ দেশের মেরু গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল।

এই এক বাস্তব, অন্য বড়ো বাস্তব গোটা পৃথিবী ফ্যাসিস্টদের গ্রাসে চলে যাচ্ছে। সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকেরা সে সময়ে মানবিক দায়ে প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সময়ের একটি বড়ো ঘটনা ফ্যাসিবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সমর্থনে ক্যালকাটা গ্রুপ নামে শিল্পী সংঘের পত্তন। বলতে হবে, ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা, প্রদোষ দাশগুপ্ত-সুভো ঠাকুর-গোপাল ঘোষ নীরদ মজুমদার-প্রাণকৃষ্ণ পাল-গোবর্ধন আশ এক কঠিন বাস্তবের মোকাবিলায় যে সাহসী পরীক্ষা চালিয়েছিলেন—সেই পরীক্ষার ফলাফল আমাদের কলাসংস্কৃতিতে আর-এক যুগান্তর ঘটায়। এই শিল্পীদের অকুণ্ঠ পোষকতা করেছেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। এই গ্রুপকে অধ্যাপক সরকার বলতেন "কলকাতার শিল্প-মজলিশ"। এঁদের প্রদর্শনী দেখে মন্তব্য করেন, "দেখে বুঝলাম—আবার বাড়তির পথে বাঙালি। ১৯০৫-১৪ সনের শিল্পযুগ অনেক পেছনে। আজ সত্যিকার নয়া বাঙলার ভরা জোয়ার।" ('বিনয় সরকারের বৈঠকে', দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৪৫, পৃ. ৬০০)।

অনেক এলোমেলো কথা বিনয় সরকার মশায়ের লেখায় থাকে। থাকে অকারণ আক্রমণের রোখ। কখনও বা তাঁকে মনে হতে পারে স্ববিরোধী। এই কারণে তাঁর লেখার ভেতরে যেতে হয় সতর্কভাবে। লক্ষ রাখতে হয়, সাময়িক প্রসঙ্গের উত্তেজনা সত্ত্বেও তাঁর মূল দৃষ্টি স্থির থাকছে কিনা। যে বিষয়ে কথা বলছেন তার প্রগতিমুখী নজিরগুলি সম্পর্কে কী তাঁর প্রতিক্রিয়া। অন্তত আমাদের কলাসংস্কৃতির বিবর্তন-ব্যাখ্যায় তাঁর শিল্পদৃষ্টির অব্যর্থতা নিয়ে খুব আপত্তি উঠবে না মনে হয়। যতটা আমি দেখে উঠতে পেরেছি তাতে কিছু উগ্রতা, কিছু অত্যুক্তি সত্ত্বেও আমাদের শিল্পকলার বিবর্তনস্তরগুলি, উত্তরণপর্বগুলির তাৎপর্য তিনি ঠিকই লক্ষ করেছেন মনে হয়েছে। কোনো গোঁড়ামি তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে নি। এই কারণে একটা পর্বের শিল্পের কর্ণধার অবনীন্দ্রনাথকে যেমন তিনি মূল্য দেন, তেমনি, কালান্তর পর্বের প্রতিভূ চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে পরিশ্রম করেন। বার বার বলেন, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শিল্প দোআঁশলা। সত্যিই তো অবাধে পশ্চিমী প্রকরণজ্ঞান অবনীন্দ্রনাথ থেকে একাল অবধি সকলে কাজে লাগিয়েছেন। "অবন হ'তে নীরদ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর চিত্রশিল্প" তাই দোআঁশলা। "একই সঙ্গে বাঙালিও বটে আবার বিদেশীও বটে।" এই গ্রহণ-বর্জনের পথেই মুক্তি আসে শিল্পে। খাঁটিত্ব খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। বিনয় সরকার মশায় সে পণ্ডশ্রম করেন নি।

ভগবদ্‌গীতার মূল শিক্ষা কী?

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

বহু যুগ ধরে গীতাকে আমরা হিন্দুদের এক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বিশ্বাস করে এসেছি। বিশ্বাস করে এসেছি, সুতরাং বিচারের প্রশ্ন ওঠে নি। বিশ্বাস এক জিনিস আর বিচার অন্য জিনিস। বিচারের প্রসঙ্গে মানুষের বুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ, বিবেক ইত্যাদি প্রসঙ্গ আসে। কিন্তু বিশ্বাসের প্রসঙ্গে বুদ্ধি, বোধ, বিবেক—এসব যে শুধু অবান্তর তাই নয়, এগুলি অনেক সময় বিশ্বাসের পক্ষে বিঘ্নকর। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আরম্ভে অর্জুন যখন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ শ্রদ্ধেয় গুরুজনদের ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তখনই অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করার জন্যে অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণাবাণী গীতা নামে প্রসিদ্ধ। ভাষণদাতা কতখানি প্রভাবশালী রূপে বক্তব্যকে উপস্থাপন করছেন এখানে সেটাই বড়ো কথা। বাক্যের বিন্যাস, শব্দের সম্ভার, ধ্বনির গৌরব, সাংখ্যের তত্ত্বের বা যোগের মহিমার পরেই কর্মযোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং তারপরেই জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গ আনয়ন এবং এভাবে ধাপে-ধাপে নাটকীয়তা নির্মাণের কৌশল—এসব বৈশিষ্ট্যে গীতার মহিমা সম্বন্ধে কে প্রশ্ন তুলতে পারে?

কিন্তু ঔচিত্যের প্রশ্ন আর আনুগত্যের প্রশ্ন একই দিকে চলে কি? আজ্ঞাপালন আর ন্যায়জিজ্ঞাসা কি একই জিনিস? হিন্দু ধর্মশাস্ত্র রূপে পরিচিত উপনিষদেই কি নচিকেতার দর্শন পাই নি? মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন শুনি নি? যমের আলয়ে এসে তিন রাত্রি নচিকেতা অনশনে অপেক্ষা করেছিলেন বলে যম ঘরে ফিরে নচিকেতাকে তিনটি বর দিতে চাইলেন। নচিকেতা প্রথম যে-দুটি বর চাইলেন যম বিনাবাক্যে তা পূরণ করলেন। তারপরে নচিকেতা তৃতীয় যে-বরটি প্রার্থনা করলেন সেটি আসলে এক মৌল প্রশ্নের উত্তর। যম ওই উত্তর না দিয়ে নচিকেতাকে বহুতর কাম্যবস্তু দিতে চাইলেন। কিন্তু নচিকেতার অবাধ্যতা অপরিসীম। ধনদৌলত চাই না, রাজ্য চাই না, রমণী চাই না, চাই আমার প্রশ্নের উত্তর। বাহুবলে অনন্য অর্জুন আর অনমনীয় অকুতোভয় নচিকেতা—কার দৃষ্টান্ত কাকে উদ্‌বুদ্ধ করে তা লক্ষণীয় নয় কি?

"গীতা কি ধর্মগ্রন্থ" গ্রন্থটির লেখক শ্রীঅমলকুমার রায় জীবিকায় ছিলেন বিচারপতি এবং জীবিকার প্রভাবেই হোক কি জীবিকা-নিরপেক্ষ কোনো দুর্মর স্বভাবেই হোক, বিনা প্রশ্নে তিনি কোনো কথাকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতারহিত—ঘটনার সত্যমিথ্যা ও পরিপ্রেক্ষিত, কর্তার অতীত জীবন ও চারিত্রিক প্রবণতা, ঘোষিত উদ্দেশ্য ও সংগুপ্ত অভিপ্রায় ইত্যাদি প্রসঙ্গে তিনি অনন্ত কৌতূহলে আক্রান্ত। ফলে প্রদত্ত প্রস্তাবের গুণাগুণ, যাথার্থ্য ও সঙ্গতিকে তিনি পদে-পদে প্রশ্ন করেন। সুতরাং আলোচনার শুরুতেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে ভীষ্ম, ভূরিশ্রবস, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্যোধনকে যেভাবে হত্যার প্ররোচনা শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন, তাতে প্ররোচনাদাতার চরিত্রের কোন্ পরিচয় প্রকাশিত হয়?

ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের পরে চারদিকে

গীতা কি ধর্মগ্রন্থ?—অমলকুমার রায়। নবার্ক, ডিসি ৯/৪ শান্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা ৭০০০৫৯। পঁচিশ টাকা।

দুর্যোধনেরই প্রশস্তি ধ্বনিত হলে পাণ্ডবগণ লজ্জিত হয়ে অধোবদন হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'নৈষ শক্যঃ অতিশীঘ্রাস্ত্রস্তে চ সর্বে মহারথাঃ ঋজুযুদ্ধেন হন্তুং যুষ্মাভিঃ, আহবে, নৈষ শক্যঃ কদাচিৎ তু হন্তুং ধর্মেণ পার্থিবঃ, তেষা ভীষ্মমুখাঃ সর্বে মহেষ্বাসাঃ মহারথাঃ ময়া অনেকৈঃ উপায়ৈঃ তু মায়াযোগেন চাসকৃৎ হন্তাস্তে সর্বে এব অদ্যৈ ভবতাম হিতমিচ্ছতা—যার সোজা অর্থ হচ্ছে এই যে, ধর্মযুদ্ধে মহারথগণকে পরাস্ত করা যেত না বলে তোমাদের হিত ইচ্ছা করে অনুচিত উপায়ে ভীষ্ম প্রভৃতির মৃত্যু ঘটিয়েছি। 'যদি নৈবংবিধং জাতু কুর্যাং জিষ্ণম্ অহম্ রণে, কুতো বো বিজয়ো ভূয়ঃ, কুত রাজ্যং, কুতো ধনম্?' যদি আমি এরকম কাজ অর্থাৎ অধর্ম কাজ না করতাম তাহলে কোথায় হত তোমাদের যুদ্ধজয়, কোথায় বা রাজ্যলাভ, কোথায় ধনলাভ হত? 'তে হি সর্বে মহাত্মানঃ চন্দ্রাঃ অতিরথাঃ ভুবি ন শক্যা ধর্মতো হন্তুম্, তথৈবায়ং গদাপাণিঃ ধার্তরাষ্ট্রঃ ন শক্যঃ ধর্মতো হন্তুম্।' ধর্মপথে অতিরথ চারজন মহাত্মাকে বধ করা যেত না, গদাহস্তে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রকেও পরাস্ত করা যেত না। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, কুরুক্ষেত্র কতটা ধর্মযুদ্ধ? যেনতেনপ্রকারেণ রাজ্যজয়ই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দুর্যোধন কোন্ অন্যায়টা করেছেন? উদ্দেশ্যসাধনে উপায়ের প্রশ্ন কি সম্পূর্ণ অবান্তর?

মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এবং এর মধ্যে ষষ্ঠ পর্বটিকে ভীষ্মপর্ব বলে; ভীষ্মপর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় থেকে দ্বিচত্বারিংশ—এই আঠারোটি অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে পরিচিত। সেজন্যে গ্রন্থকার গীতার থেকে সমস্ত উদ্ধৃতিরই উৎস গীতার অধ্যায়-পদ-ভাগ অনুসারে নির্দেশ না করে মহাভারতের পর্ব-পদ-ভাগ অনুসারে নির্দেশ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই গীতাকে আমরা মহাভারতের অংশ হিসেবে দেখব, না কি পূর্বাপরঘটনাবিযুক্ত এবং অন্যান্য-চরিত্রাবলীবিচ্ছিন্ন রূপে শুধুই ভক্তের জন্যে ভগবানের ভাষণ হিসেবে দেখব? আমরা কি আগে থেকেই ধরে নেব যে দুর্যোধন যা-যা করেছে, করছে আর করবে—সবই অধর্ম, আর শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবপক্ষ যা-যা করেছে বা করছে বা করবে—সবই উচিত কর্ম? বহু মহাভারতকার পাণ্ডবপক্ষের সমর্থন রূপে মহাভারতের কাহিনী সম্পাদনাপূর্বক উপস্থাপন করেন নি কি? মহাভারতের বহু অংশেই শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিপ্রয়োগের অব্যর্থ নৈপুণ্য, বাক্যরচনার অনন্য কলাকৌশল, শব্দের আশ্চর্য সম্মোহন এবং সব মিলিয়ে বিশ্বরূপের নাটকীয় ইন্দ্রজাল আমাদেরকে অবশ্যই অভিভূত করে। কিন্তু তাই বলে কি এ সবই ন্যায়ধর্মের সার্বভৌম প্রমাণ?

অহঙ্কারত্যাগ, বিনয়ের গুণ, ফলে নিরাসক্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ প্রেরণাদায়ক বটে, কিন্তু সেই ভাষণরূপী গীতার বেশিটাই কি ভগবানের দিক থেকে আত্মবাক্যের সদম্ভ ক্রীড়াযোগ নয়? ভক্ত ব্যতীত ভগবান যেমন মহিমা-শূন্য, তেমনই পাষণ্ডের প্রতিক্রিয়া রূপেই কি ভগবানের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হয় না? তাহলে কি ভগবানের মহিমা একই সঙ্গে ভক্ত ও পাষণ্ডের অস্তিত্বসাপেক্ষ নয়? গীতা কি ভক্তের বোধবুদ্ধিকে বিবশ আর জিজ্ঞাসাকে বিনাশ করে না? তার ফলে ভক্ত কত প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করতে শেখে তার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় দ্রোণহত্যার প্রসঙ্গে। দ্রোণকে মিথ্যা করে বলতে হবে যে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। অর্জুনও এই মিথ্যাচারণে অস্বীকার করলে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'সত্যাৎ জ্যায়ঃ অনৃতং বচঃ, অনৃতং জীবিতস্যার্থে বদন্ ন স্পৃশ্যতে অনৃতৈঃ' অর্থাৎ সত্য অপেক্ষা মিথ্যা বলো, কারণ জীবিত থাকার জন্যে মিথ্যা বললে মিথ্যা স্পর্শ করে না। পৃথিবীর সমস্ত দুষ্কৃতকারীর জন্যে এখানে অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে নাকি? আর আমরা জানি যে প্রাণরক্ষার জন্যে দ্রোণকে হত্যা করা হয় নি, রাজ্যলাভের জন্যে পথের কাঁটা হিসেবে হত্যা করা হয়েছিল। তাহলে কি অধর্ম দিয়ে ধর্ম, মিথ্যা দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়? আবার

সেই উদ্দেশ্য আর উপায়ের প্রসঙ্গ এসে গেল।

এই গ্রন্থের প্রধান এবং প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, কঠোপনিষদের নবীন নায়ক নচিকেতার মতো গ্রন্থকার প্রশ্ন করেছেন এবং পাঠকদের মনে প্রশ্নগুলি সঞ্চার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণভাষিত গীতার উদ্দেশ্য হল বিমুখ ও বিষণ্ণকে উন্মুখ ও উদ্যত করা, নিদ্রিতকে জাগ্রত, নিষ্ক্রিয়কে সক্রিয় করা এবং এই আদর্শ অনুসরণ করে শ্রীঅমলকুমার রায়ও একই উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন। অবশ্য গীতার ব্যাখ্যার চাইতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রব্যাখ্যাই বেশি করেছেন। কিন্তু যেখানে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে তাঁর বিশ্লেষণী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আমাদের শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করে। এ প্রসঙ্গে তিনি গীতার 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত' এবং 'য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে' শ্লোক দুটির যে-ব্যাখ্যা করেছেন তার উল্লেখ করব; কারণ, এখানে যুদ্ধ এবং হত্যার প্রসঙ্গ বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত। যে শরীরে অনন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছে সেই শরীরের অন্ত আছে। অতএব, ভারত, যুদ্ধ করো তথা হত্যায় ব্রতী হও। যে ভাবে যে সে হত্যা করছে এবং যে ভাবে যে এটাই হত হওয়া, দুজনেই সত্যোপলব্ধিতে ব্যর্থ, হত্যাও করে না কেউ, হতও হয় না কেউ। অর্থাৎ হত্যা ব্যাপারটাই অধ্যাস। হত্যাকর্ম যদি অলীক হয় তাহলে তার নিষ্পাদনে অন্যায় হবে কেন? এবং এর পরে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে যুদ্ধ বা হত্যা যদি উপলব্ধির ভ্রান্তিই হয়, তাহলে তাতে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ প্রণোদিতই বা করলেন কেন?

গ্রন্থকার দুভাবে আপন জিজ্ঞাসা বা বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। প্রথমত, মহাভারতের নানা অংশ থেকে শ্রীকৃষ্ণের আচরণ এবং উচ্চারণ উল্লেখ করে স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগিয়েছেন যে এমন চরিত্রের পক্ষে কোনো ধর্মপথ নির্দেশ করা কি সম্ভব? দ্বিতীয়ত, গীতার নানা অংশ থেকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে উক্তিগুলির ভক্তিসঞ্জাত ব্যাখ্যা একরকম এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা অন্যরকম। যেমন 'য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্' উক্তির মধ্যে অমলকুমার রায় দেখেছেন নির্বিচারে হত্যার সমর্থন আর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ দেখেছেন সাংখ্য-কথিত পুরুষ ও প্রকৃতির রহস্য এবং এর সঙ্গে তুলনা করেছেন এমার্সনের ব্যঞ্জনা: If the red slayer thinks he slays, / Or if the slain think he is slain, / They know not well the subtle ways / I keep and pass and turn again ভগবদ্গীতার সার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে অমলকুমার রায় শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর উক্তি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ একটি কথাই সবচেয়ে বেশিবার বলেছেন: সমৃদ্ধ রাজ্য লাভের জন্যে যুদ্ধ করো, যুদ্ধ করো, যুদ্ধ করো। 'যুদ্ধে প্ররোচনা দানই কৃষ্ণের উক্তিসমষ্টির সার, ভগবদ্গীতার সার।' অবশ্য ভগবদ্গীতার মধ্যে-মধ্যে অর্জুনের নিগূঢ় জিজ্ঞাসাও আছে: 'কিংতদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন মধুসূদন প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ।' অর্জুনের মতো আমরাও প্রশ্ন করতে পারি: গীতার মূল শিক্ষা কী? গৌণ শিক্ষাই বা কী? ভক্তি কী আর যুক্তিই বা কী? বিশ্বাস কী? বিচার কী? উদ্দেশ্য কী? উপায় কী? এরকম নানা জিজ্ঞাসায় উৎসাহদানেই এই গ্রন্থের সার্থকতা। গীতাচর্চায় এ গ্রন্থ অবশ্যই একটি অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন।

প্রসঙ্গ প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং নানা বিষয়ের প্রবন্ধ

রণেন্দ্রনাথ দেব

বাঙলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্য সম্বন্ধে এ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা একটিমাত্র বইতে পাওয়া যেত—ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত "বাংলা সাহিত্যের একদিক।" ড. সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি এ বিষয়ে নবাতম সংযোজন।

প্রবন্ধ কাকে বলে? শুধুমাত্র প্রকৃষ্টবন্ধনযুক্ত রচনাকে প্রবন্ধ বললে বিষয়টি স্পষ্ট হয় না। প্রথম পরিচ্ছেদে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে প্রবন্ধের ব্যাপক প্রসার ঘটে থাকলেও এর রূপকল্প সম্বন্ধে বিশদ তথ্যের আজো অভাব। প্রবন্ধ কি শুধু স্বল্পায়তন রচনা? ড. বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, স্যার টমাস ব্রাউনের দীর্ঘ রচনাও প্রবন্ধ বলে গণ্য হওয়া উচিত। এমনকী নাট্যাকারে পরিবেশিত বঙ্কিমচন্দ্রের "ব্যাঙ্গাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল"র মতো লেখাকেও তিনি প্রবন্ধ বলে স্বীকার করেন। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত—'আঙ্গিকে, অঙ্গরূপে (form) এবং রূপকল্পে (image) স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান কালের প্রবন্ধ বৈচিত্র্যময়; তার কোথাও বা তথ্য ও তত্ত্বের উদ্ভাস, আবার কোথাও বা পল্লবগ্রাহী একটি ব্যক্তি-মানসের স্বগতোক্তির ভাবনির্ঝর। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও কিন্তু শাখাটিতে দুটি মৌল ধারা লক্ষণীয়। এক শ্রেণীর প্রবন্ধে মস্তিষ্কজাত নানা চিন্তার সমাবেশ, নৈয়ায়িক বন্ধনের প্রবণতা; অন্য শ্রেণীতে শিল্পীর মনের মাধুরী, তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনার লাবণ্যে রচনাটি উদ্ভাসিত। কোনোটির গতি স্বচ্ছন্দ, প্রাণস্ফূর্ত, কোনোটি হয়তো বা চিন্তার গুরুভারে হতশ্বাস, স্তিমিতপ্রাণ। ভিন্নমুখী এই দুটি ধারার নানা ভাব, নানা ভঙ্গি, কিন্তু লঘুগুরু যেভাবেই হোক, সকলেরই গন্তব্য সেই সাহিত্যের মহাসঙ্গম। উদ্দেশ্য এক হলেও কিন্তু সে লক্ষ্যে সবাই কি আর পৌঁছতে পারেন! আরো অনেক শিল্পের মতো প্রবন্ধশিল্পে সফলতা প্রতিভা-নির্ভর, লেখকের ক্ষমতা-অনুগত।'

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত যে রচনায় "সাহিত্যিক নির্মিতির" চিহ্ন আছে, যে শিল্পকর্ম সাহিত্যরসসমৃদ্ধ, শুধু সেইসব প্রবন্ধকে "রচনা" এই নতুন নামে চিহ্নিত করেছেন। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন, 'কাব্য, নাটক, উপন্যাসের মতো প্রবন্ধও উৎকৃষ্ট, সাধারণ, অপকৃষ্ট ইত্যাদি নানা শ্রেণীর হতে পারে, কিন্তু রসসমৃদ্ধ 'সাহিত্যিক সৃষ্টি' না হলে সে রচনা কৌলীন্য হারিয়ে শুধু প্রবন্ধ নামে অন্ত্যজ, অপাংক্তেয়, অবমূল্যায়িত হয়ে থাকবে, এ তত্ত্ব বোধহয় বাস্তবসম্মত নয়।' ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মত গভীরভাবে ভেবে দেখবার যোগ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদের পরবর্তী অংশে মনটেইন বেকন থেকে শুরু করে লে হানট, হ্যাজলিট, চার্লস ল্যাম, ই ভি লুকাস, রবার্ট লিনড পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধরচয়িতাদের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রামমোহন, কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় নিবিড় নয়। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণমোহনের বিদ্যাকল্পদ্রুম থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর গদ্যশৈলীর উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গদ্যরচনা ছিল সংস্কৃতের ভারমুক্ত এবং তাঁর সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যিক গুণে পূর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভূদেব ও রাজনারায়ণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ। পঞ্চম পরিচ্ছেদ পুরোটাই বঙ্কিম বিষয়ক। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে সঞ্জীবচন্দ্র, অক্ষয় সরকার ও রাজকৃষ্ণ এবং সপ্তম পরিচ্ছেদে চন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের কথা। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক আলোচনাটিই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গভীর। "লোকরহস্য" ও "কমলাকান্তের দপ্তর" কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ তা লেখক যুক্তিসহযোগে দেখিয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি বাঙলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের উপকারে লাগবে। এটি প্রস্তাবিত গ্রন্থের ১ম খণ্ড মাত্র। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করব।

লেখকের ভাষা আর প্রকাশভঙ্গি সাবলীল। তাঁর বক্তব্য বিষয়কে সুশৃঙ্খলভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন। তবে কোথাও-কোথাও মনে হয় 'প্রবন্ধের' ইতিহাস নয়, বইটি 'গদ্যসাহিত্যের বিকাশের' ইতিহাস হয়ে পড়েছে।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের গ্রন্থের পরে এই গ্রন্থ নতুনতর আলোচনার পথ প্রস্তুত করল।

সুপরিচিত সাময়িকপত্র "অনীক"-এর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৬৪ থেকে ১৯৮৮-র মধ্যে প্রকাশিত রচনার একটি সংকলন ইতিপূর্বে বার হয়েছে। আলোচ্য স্মারক গ্রন্থটি তার সম্পূরক সংকলন। যাঁরা প্রথম খণ্ডটি পড়ে তৃপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা দ্বিতীয় খণ্ডটি দেখেও আনন্দিত হবেন।

এ বইতে প্রথম রচনাটির নাম "অনীক-এর পঁচিশ বছর"। পঁচিশ বছরে অনীকের মতাদর্শে কতটা পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটেছে তা স্তরে-স্তরে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। সংকলক বলেছেন, অনীক-এর বয়ঃপ্রাপ্তির ইতিহাস সমকালীন বিপ্লবী চিন্তার চলমান দর্পণও বটে। ১৯৬৪ সালে সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—নাম "পুনশ্চ"। ১৯৬৪-র এপ্রিল থেকে ১৯৬৫-র অকটোবর পর্যন্ত প্রকাশিত পাঁচটি সংখ্যায় স্থান পেয়েছিল মোটামুটি বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা। এরপর পত্রিকার রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনে পুনশ্চ নতুন নাম "অনীক" গ্রহণ করে। অনীক কথাটির অর্থ সেনাবাহিনী বা বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ। ১৯৬৬-র মার্চে পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় অনীক নামে। প্রকাশের সেই মুহূর্তে 'পশ্চিমবাংলার ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনে '৬২-র পরবর্তী নিষ্ক্রিয়তা ও অবসাদের মানসিকতাকে ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিলো জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ। অনীক-ও জনতার সেই বাঁধভাঙা প্লাবনে পায়ের তলায় এই প্রথম যেন মাটি খুঁজে পেলো।'

১৯৬৭ থেকে '৭০ সাল অনুসন্ধানপর্ব। একদিকে অনীক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাও সেতুঙের নেতৃত্বাধীন চীনের বিপ্লবী লাইনের দৃঢ় সমর্থক হয়। অন্যদিকে আবার ভারতের জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষত ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে ভুল মূল্যায়ন অনীক-এর প্রকৃত অর্থে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। ...এর সঙ্গে-সঙ্গে এই সংখ্যাগুলিতে সি. পি. আই(এম)-এর ওপর প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধ, রাষ্ট্রচরিত্রগত প্রশ্নে ভুল অবস্থান সত্ত্বেও এই পার্টিটির ক্রমশ-প্রকাশিত বিপ্লব-বিরোধী চরিত্র ও সংশোধনবাদী লাইনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখতে পারে।' এই সময়পর্ব ঘটে নকশালবাড়ির ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রাম। 'উল্লেখ্য যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের আগেই অনীক-এ সি. পি. আই (এম)-এর বিপ্লব-বিরোধী প্রবণতা সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করে'।

১৯৭১-৭২ সাল উত্তরণের পালা। দুটি সংখ্যায় 'সি. পি. আই (এম-এল)-এর কোনো বিশেষ গ্রুপ বা

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভূমিকা (১ম খণ্ড)—ড. সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩। ডিসেম্বর ১৯৮৮। পৃ ১৫০। পঁচিশ টাকা।

অনীক : পঁচিশ বছর স্মারক গ্রন্থ। জুলাই ১৯৮৯। পঁচিশ টাকা।

অষ্টাদশ শতকের প্রান্তে বাঙলা ও বাঙালী—শ্যামাপ্রসাদ বসু। কাকলি প্রকাশনী, মেদিনীপুর। মহালয়া ১৩৯৫। পৃ ১৮৬। পঁচিশ টাকা।

গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত না থেকেও, সামগ্রিকভাবে নকশালপন্থী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলো'। এই পর্বে আরেকটি ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকচক্রের প্রত্যক্ষ মদতপুষ্ট শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলো'। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক জনমতে প্রচণ্ড ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। '৭১-এর মে মাসে অনীক "পূর্ববাংলা সংখ্যা" প্রকাশ ক'রে শেখ মুজিবচক্র তথা ভারতীয় শাসকচক্রের তথ্যভিত্তিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব পালন করেছিল। ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসে অনীক-এ প্রকাশিত হয় ফেলিক্স্ গ্রীনের "দি এনিমি" গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল—'আমাদের বিরুদ্ধে আরেকটি সমালোচনা হোচ্ছে : অনীক-এর মতো একটি আইনী পত্রিকা বের কোরে কোনো লাভ নেই, কারণ আইনী যে কোনো কাজই আসলে "সূক্ষ্ম সংশোধনবাদী"। এ বক্তব্যটিও আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। কেবলমাত্র আইনী কর্মপদ্ধতির মাধ্যমেই বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে—এ বক্তব্য যেমন ভুল, ঠিক তেমনি ভুল যে কোনো আইনী কর্মপদ্ধতিকেই "সূক্ষ্ম সংশোধনবাদী" আখ্যা দিয়ে বাতিল কোরে দেওয়া।'

১৯৭২-এর জুলাই মাসে অনীক মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৭২ থেকে ৭৫—এই কালপর্বে অনীক ছিল ঝড়ের কেন্দ্রে। 'ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল'-গত লাইনের প্রশ্নে এ সময়ে অনীক খানিকটা দুঃসাহসের সঙ্গেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্কের সূচনা করেছিলো। ক্রমশ সংসদীয় রাজনীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার পরিণতিতে সি. পি. আই.-সি. পি. আই(এম) কার্যত বিপ্লব-বিরোধী অবস্থানে চলে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে সি. পি. আই(এম-এল) প্রথম থেকেই সংসদীয় নির্বাচন বয়কট করার লাইনকে অপরিবর্তনীয় এক রণনীতিগত লাইন হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। বস্তুত এটা ছিল সি.পি. আই(এম-এল) অনুসৃত 'বাম' লাইনেরই বহিঃপ্রকাশ। ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি গণ-আন্দোলনকে এইসব আধুনিক সংশোধনবাদী দলগুলি অর্থনীতিবাদী আন্দোলনে পর্যবসিত করার ঘটনা যেমন সি. পি. আই(এম-এল)-কে সামগ্রিকভাবে গণ-আন্দোলন-বিমুখতার ভ্রান্ত 'বাম' লাইনে ঠেলে দিয়েছিল ঠিক তেমনি এই দলগুলির সংসদীয় নির্বাচন-সর্বস্বতা নির্বাচনকে চিরস্থায়ীভাবে বয়কটের এই নকশালপন্থী লাইনের জন্ম দিয়েছিলো—এবং এই দু'টি লাইনই গণ-অন্দোলন ও সংসদ সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষার বিরোধী ছিল।'

১৯৭৫-এর জুলাই সংখ্যায় "ঝড় আসছে" এই সম্পাদকীয় ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ঝড় এসে অনীকের কণ্ঠ রুদ্ধ করে। ঝড়ের অবসানে ১৯৭৭-এর অগস্ট সংখ্যা থেকে অনীক-এর নতুন জন্ম শুরু হয়। পুনঃপ্রকাশের পর প্রথম সুযোগেই অনীক মাও সে-তুঙের স্মরণে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলা হয়—'বিগত এমার্জেন্সির দুঃস্বপ্নময় দিনগুলিতে দক্ষিণপন্থী সি. পি. আই কংগ্রেসের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতম প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, সি. পি. আই (এম) আজ সেই একই. বা সম্ভবত বেশীমাত্রায় প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে—তার বাহ্যিক রূপটি যাই হোক না কেন। এর তুলনায় সি. পি. আই-ও সম্ভবত আজ বেশী ইন্দিরা-বিরোধী।' অন্যদিকে 'এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে নকশালপন্থীদের খতমের লাইন ছিল পুরোপুরি একটি মার্কসবাদবিরোধী লাইন, প্রচলিত গণ-আন্দোলন থেকে দূরে থাকার লাইনটি ছিল একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ এবং রণনীতিগতভাবে সংসদীয় রাজনীতি বর্জনের লাইনটি ছিল একটি বাম সঙ্কীর্ণতাবাদী অবস্থান।' সংকলক মন্তব্য করেছেন—'নকশালবাড়ী আন্দোলনের নেতিবাচক দিকগুলো

সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। তা বলে একথা আমরা মনে করি না যে নকশালবাড়ী আন্দোলনের কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই। একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে নকশালবাড়ীর একটি দশক আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলনকে মানসিকতার দিক থেকে অনেক বেশি পরিণত করে দিয়ে গিয়েছে।'

"অনীকে"র চিন্তাধারায় পঁচিশ বছরের বিবর্তনের ইতিহাসটি তাৎপর্যপূর্ণ।

সংকলিত রচনাগুলির মধ্যে আছে—চীন প্রসঙ্গে চারটি লেখা—সাংস্কৃতিক বিপ্লব (দি ব্রডশীট পত্রিকার সেপটেম্বর ১৯৬৬ সংখ্যা থেকে অনুবাদ); মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ৮.৮.৬৬); লিন পিয়াও পার্টিবিরোধী চক্রের সামাজিকভিত্তি প্রসঙ্গে (ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান); চীন, সমাজতন্ত্র এবং কিছু মৌলিক প্রশ্ন (তরুণ রায়)। রাশিয়া প্রসঙ্গে পাচ্ছি তিনটি লেখা—সমাজতন্ত্র থেকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ—একটি রাজনৈতিক রূপরেখা (সত্যেন মিত্র); ক্রেমলিনের নতুন মুখ (সুচরিতা সেন); পেরেস্ত্রয়কা: সমাজতন্ত্রের বিকাশ (পর্যবেক্ষক)। বাংলাদেশের যুদ্ধ প্রসঙ্গে পুনরুদ্রিত হয়েছে—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকা এবং এই যুদ্ধের চরিত্র (বিশ্বময় দে)। নকশালবাড়ি আন্দোলন বিষয়ে চারটি রচনা রয়েছে—ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ (চীনের পিপলস্ ডেইলি পত্রিকার সম্পাদকীয়: ৫.৭.৬৭); চারু মজুমদার প্রসঙ্গে; যেন ভুলে না যাই (রঞ্জনকুমার মিত্র); বিকল্প রাজনীতির সন্ধানে (নিরঞ্জন বসু)। কাশীপুর-বরানগর ঘটনার কথা যাঁদের স্মরণে আছে রঞ্জনকুমার মিত্রের লেখাটির তাঁরা প্রশংসা করবেন।

অনীকের এই সংকলনটি বামপন্থী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের অবশ্যপাঠ্য—এটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট।

অনীকের সম্পাদকমণ্ডলী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের স্মৃতিতর্পণ করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তাঁরা কুয়াশামুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান করেছেন। কামনা করি তাঁরা নিজেরা এ দৃষ্টিলাভ করুন এবং পাঠকদেরও নির্মোহ করে তুলুন। প্রসঙ্গত একটি কথা বলি। আলবানিয়ার আনোয়ার হোজা সম্পর্কে তাঁরা লিখেছেন :

'যে হোজা ১৯৭৬-এ মাও সে-তুং-এর মৃত্যুর পরে পরেই মাও সে-তুং-এর প্রতি এই বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন যে, "চীনা জনগণের গৌরবময় বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজে অর্জিত ঐতিহাসিক বিজয়, নয়া গণচীনের প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র দুনিয়ায় তার উচ্চ মর্যাদা—এ সব কিছুই প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত মহান বিপ্লবী কমরেড মাও সে তুং-এর নাম, শিক্ষা ও পরিচালনার সঙ্গে"... সেই হোজাই আবার মাত্র দু বছর পরে ১৯৭৮-এ লিখেছিলেন যে মাও সেতুং কোনোদিন মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী ছিলেন না; সেই ১৯৫৫-এ চীনের পার্টির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই মাও বিভিন্ন ধরনের সংশোধনবাদী তত্ত্বের সঙ্গে ভাববাদী, প্রয়োগবাদী, সুবিধাবাদী তত্ত্ব ও দর্শনের সংমিশ্রণে তাঁর তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন, তাই তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনো সম্পর্ক কোনোদিনই ছিল না; দ্বন্দ্ব, শ্রেণী ও বিপ্লবের পথ সম্পর্কে মাও সেতুং যেসব মার্কসবাদবিরোধী ধারণার জন্ম দিয়েছেন তার ফলে চীনে কখনই সমাজতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে নি।'

আনোয়ার হোজার এই মতপরিবর্তনের কারণ কী? তিনি কি মাও সেতুং-এর মতবাদের পেছনে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলেন? হোজার মত কি উপেক্ষণীয়?

এরকম কিছু-কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে জাগলেও অনীকের সম্পাদকমণ্ডলীকে আমরা সাধুবাদ জানাই তাঁদের দীর্ঘ পরিশ্রম ও সংকল্পের জন্য। তবে এরকম

দামি বই আরেকটু ভালো কাগজে ছাপা হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

বাঙলা ভাষায় আজকাল ইতিহাস আলোচনার অভাব নেই। বিশেষত বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে বেশ কিছু ভালো বই রচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি এ কারণে ঔৎসুক্য জাগায়। এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত নাতি-বৃহৎ এই বইটির আলোচ্য বিষয়গুলি হল—সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে বাঙলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ; মুর্শিদকুলী খাঁ: দেওয়ান এবং সুবাদার; বাঙলায় জমিদারদের বিদ্রোহ; ত্রিপুরা, কুচবিহার এবং আসামের সাথে বাঙলার রাজনৈতিক সম্পর্ক; সুবার শাসনব্যবস্থা; ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী : ১৭২৭ পর্যন্ত; ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী : ১৭২৭ পর্যন্ত; ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী : ১৭২২ থেকে ১৭২৭ পর্যন্ত; অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালীর জীবনযাত্রা; মূল্যায়ন।

লেখক যে ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন তা মুখ্যত রাজনৈতিক। সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্বন্ধে আলোচনা স্বল্প। দশম অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালির জীবনযাত্রার বিবরণ মাত্র আট পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। পরের অধ্যায় "মূল্যায়ন" আরো সংক্ষিপ্ত। মাত্র চার পৃষ্ঠা। এ বিষয়ে লেখকের ঔৎসুক্যহীনতা স্পষ্ট। রাজনৈতিক বর্ণনাও মূলত মুর্শিদকুলী খাঁর জীবন ও কর্মসংক্রান্ত। এক্ষেত্রে লেখক দুয়েকটি নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। সম্ভবত লেখকের গবেষণাকর্মের উপর ভিত্তি করে মুর্শিদকুলী খাঁ বিবরণীটি প্রস্তুত।

শ্রীবসু যে বিষয় নিয়ে লিখেছেন তা নিয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হতে পারত। ওই পর্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় তিনি ভারতচন্দ্রের ও রামেশ্বর চক্রবর্তীর রচনা ছাড়াও আরো বহু উপাদানের সাহায্য নিতে পারতেন। এ গ্রন্থের নতুন সংস্করণ বার করার প্রয়োজন হলে আশা করা যায় তিনি এ দিকে দৃষ্টি দেবেন।

প্রসঙ্গ রম্য গণিত

বসন্তকুমার সামন্ত

এক, দুই, তিন……সিসেম খোলো দ্বার
মন্ত্রবলে খুলে গেলো রূপের পারাবার।

জনাব এ. কে. বজলুল করিম 'এক, দুই, তিন' প্রবন্ধের চাবি দিয়ে 'গণিতের রহস্যপুরী'র দরজা আমাদের কাছে খুলে দিয়েছেন। সেই রহস্যপুরীতে যে অসাধারণ ঐশ্বর্যভাণ্ডার আছে তার কিছু অংশ পরবর্তী চল্লিশটি গাণিতিক প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে এনেছেন তিনি। আরব্য উপন্যাসের অসাধারণ গল্প 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর'-এর চল্লিশ সংখ্যাটির জের কি এখানে থেকে গেছে?

করিম সাহেবের গাণিতিক প্রবন্ধগুলির নামকরণ বেশ মজার; গণিত-ভীত পাঠকের মনকেও আকৃষ্ট ক'রে তাকে মজার রাজ্যে টেনে আনার জাদু আছে সেখানে: 'যে নাবিক হারায়েছে দিশা', 'খেয়ালী মামার ড্রিল', 'ইতিহাস কথা কও', 'সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে', 'সাতকড়ির সম্পত্তি', 'গুজব ছড়ায় হাওয়ার আগে', 'খেয়ালী মামার হেঁয়ালী', 'কৃপণের রিলিফ ফাণ্ড', 'শুভপুর বাইপাশ' ইত্যাদি। এইসব মজার নামের টানে রহস্যপুরীতে ঢুকে পড়লে গণিত-রাজ্যের যে মজার-মজার খবর পাওয়া যাবে, তা ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছা করবে না। এ ধরনের গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যও তাই—মজার মধ্য দিয়ে শেখা, খুশির মাধ্যমে জানা। করিম সাহেব সেইভাবে এগিয়েছেন এবং 'ম্যাথেমেটিক্স্' নিয়ে যাতে 'মাথা মাটি' হয়ে না যায় তার জন্য কিশোর পাঠকদের পথ দেখিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন অঙ্ককে 'গোমড়ামুখো গুরুমশায়'-এর ভূমিকায় না দেখে যাতে তাকে রসালাপী বন্ধু ভাবা যায়।

গণিতের রহস্যপুরী—এ. কে. বজলুল করিম। মুক্তধারা। ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা ১, বাংলাদেশ, সেপটেমবর ১৯৮৬। বত্রিশ টাকা / চব্বিশ টাকা।

গ্রন্থকার সংখ্যাজগতের যেসব তত্ত্ব আর তথ্য তাঁর সাত ফর্মার বইয়ে পাঠকদের কাছে হাজির করেছেন, তার সবগুলির মূল কথা আলোচনার সীমাবদ্ধ পরিসরে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। তাই নমুনা হিসাবে বিভিন্ন ধরনের তিনটি মজার গাণিতিক রহস্যের কথা আলোচিত হচ্ছে। 'ইতিহাস কথা কও' অধ্যায়ে জানা যাচ্ছে কেমনভাবে পঞ্জিকা (calendar) সংস্কারের জেরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অকটোবরে অনুষ্ঠিত বিপ্লবের বার্ষিকী পালিত হচ্ছে ৭ই নভেমবর তারিখে, কিভাবে সম্রাট আকবরের আমলে রাজকীয় প্রয়োজনে সে সময়ে চালু বৎসর 'হিজরি'র বদলে সৌর বৎসর হিসাবে বাঙলা সাল প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং কেন নীল আর্মস্ট্রং-এর চাঁদে অবতরণের তারিখ হিসাবে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই ও ২১শে জুলাই—দুটো তারিখই একই সঙ্গে নির্ভুল। গুণোত্তর শ্রেণীর (Geometric Series) যোগফলের সাহায্যে করিম সাহেব 'গুজব যে হাওয়ার আগে ছড়ায়' তা প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন। সকাল ৯টায় কোনো মুখরোচক খবর জেনে শ্রোতা পনেরো মিনিটে যদি পাঁচ জনকে তা শোনান এবং তাঁদের প্রতি জনে যদি পরবর্তী পনেরো মিনিটে পাঁচজনকে সে খবর জানান, এই-ভাবে গুজব ছড়াতে শুরু করলে সকাল ১১টায় অর্থাৎ দু ঘণ্টার মধ্যে সেই খবর পৌঁছাবে মোট ৪, ৮৮, ২৮১ জনের কাছে অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের কানে। 'উল্টে গিয়ে ডিগবাজী' অধ্যায়ে এমন চার অঙ্কের সংখ্যা খুঁজতে বলা হয়েছে যার চার গুণ করলে সংখ্যাটি উলটে ডিগবাজি খায়। হিসাব করে অঙ্ক ক'যে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন সংখ্যাটি ২১৭৮। এইভাবে বিভিন্ন মজার প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে "গণিতের রহস্যপুরী"তে।

অসাধারণ রামানুজন—কিছু দিন আগে শত-বার্ষিকী উৎসবে যাঁকে স্মরণ করা হয়েছে, তিনি গাণিতিক হার্ডির ট্যাক্সির নম্বর ১৭২৯ দেখে সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিলেন যে এর চেয়ে সুন্দর সংখ্যা গণিতের জগতে বিরল; এটি হচ্ছে সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যা—যেটি দুভাবে দুটি সংখ্যার ঘনফলের সমষ্টি অর্থাৎ $১৭২৯ = ১^৩ + ১২^৩ = ৯^৩ + ১০^৩$। রামানুজনের জীবনের এই কাহিনী 'যাদুগীর রামানুজন' প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে। তবে রামানুজন সে-সময়ে যা বলেছিলেন তার বাইরে সংখ্যাটির আরও অনেক বিশেষত্ব আছে, যা ওই প্রবন্ধে প্রসঙ্গত আলোচনা করার অবকাশ ছিল। যেমন, $১৭২৯ = ৫৫^২ - ৩৬^২ = ৭৩^২ - ৬০^২ = ১২৭^২ - ১২০^২ = ৮৬৫^২ - ৮৬৪^২$। ১৭২৯-এর উৎপাদক ১, ৭, ১৩, ১৯, ৯১, ১৩৩, ২৪৭ এবং এগুলির যোগফল $৫১১ = ৮^৩ - ১^৩$ অর্থাৎ দুটি ঘনসংখ্যার বিয়োগফল। আবার, ১৭২৯-এর উৎপাদকগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় $৭ = ৪^২ - ৩^২$, $১৩ = ৭^২ - ৬^২$, $১৯ = ১০^২ - ৯^২$, $৯১ = ১০^২ - ৩^২$, $১৩৩ = ১৩^২ - ৬^২$, $২৪৭ = ১৬^২ - ৩^২$ অর্থাৎ এদের সবগুলিই দুটি বর্গসংখ্যার বিয়োগফল।

ফিকেলাক্কি সংখ্যামালা ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪··· নিয়ে যে আলোচনা আছে তা কৌতূহলোদ্দীপক। প্রাকৃতিক জগতের অনেক রহস্যের সঙ্গে এই সংখ্যাশ্রেণীর সাদৃশ্যের সন্ধান পরবর্তী কালে মিলেছে। তাই এ বিষয়ে আরও গবেষণা চলেছে। 'প্রকৃতি ও জ্যামিতি' এক উপভোগ্য প্রবন্ধ। আজকের যন্ত্রগণকের যুগে 'বাইনারী সিস্টেম' বা দ্ব্যংশক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। 'একটি বাহাদুর সংখ্যা' ১০৮৯ নিয়ে অনেক কথা আছে। গ্রন্থকার এই মজার সংখ্যার প্রতীকী নামকরণ করেছেন—'এশূআন' এবং এর একাধিক গুণের পরিচয় দিয়েছেন। ডিগবাজি খাওয়া আলোচিত সংখ্যা ২১৭৮ বাহাদুর সংখ্যা ১০৮৯-এর দ্বিগুণ। আবার, ন গুণের

ক্ষেত্রে ১০৮৯ নিজেও ডিগবাজি খায়। বইটির শেষ প্রবন্ধ 'যোগাযোগ' অবশ্য তেমন ভাবে গাণিতিক নয়; এটি মূলত দার্শনিক আলোচনা।

এ ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার বিভাজ্যতা, কোনো নির্দিষ্ট তারিখের বার নির্ণয় ও তাপনির্ণয়ের ক্ষেত্রে সেনটিগ্রেড স্কেল থেকে ফারেনহাইট স্কেলে পালটাবার একটি নূতন নিয়ম সংযোজিত করে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করেছেন। জাদুবর্গ (magic square) তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ম দুটি অনেককে মজার জাদুবর্গ নির্মাণে উৎসাহিত করবে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, লেখক যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন তা নিয়ে আরও জানার অবকাশ আছে। আগ্রহী পাঠকের জন্য তেমন বইয়ের তালিকা গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হলে ভালো হত।

এ ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গ্রন্থকারের এই প্রয়াসের জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ তাঁর নিশ্চয়ই প্রাপ্য। মনে রাখতে হবে—জনাব এ. কে. বজলুল করিম ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ. এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্যের মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকারি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। গণিত তাঁর ভালোবাসার বিষয়। তাঁর গণিত-সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধ বিলাতের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। করিম সাহেব পাঠকদের জন্য তাঁর গণিত-চিন্তার ফসল হিসাবে 'Alice in Numberland', 'Falgooni Numbers' প্রভৃতি ইংরাজি পুস্তকের সঙ্গে বঙ্গভাষায় লেখা "গণিতের রহস্যপুরী" উপহার দিলেন। লিওপোল্ড ক্রোনেকার বলেছিলেন—'God gave us integers, everything else is man's handiwork'. আলোচ্য পুস্তক জনাব করিমের এমনই এক 'handi-work' একথা ভেবে বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি অবসর জীবনে ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত গণিত-অধ্যাপক মোহম্মদ আবদুল ছবুর যে কথা বলেছেন, সে কথা আমাদেরও।

অ. কৃ. ব.-র দুখানি নতুন বই

দিগম্বর দাশগুপ্ত

কবি ও কথাসাহিত্যিক অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব) স্কুলজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চার সঙ্গে-সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে জাদু ও সঙ্গীতের চর্চা নিবিড়ভাবেই করে এসেছেন। তাঁর পিতা শৈলেন্দ্রমোহন বসুও ছিলেন একজন সুগায়ক, বিশেষত ভক্তিরসের গানে এবং কীর্তনে। স্বভাবতই পিতৃসূত্রে সঙ্গীতের প্রতি অ. কৃ. ব.-র অনুরাগ একেবারে তাঁর শিশু-বয়স থেকেই। বাল্যকালে তাঁর প্রথম গানের তালিম শুরু হয় সেকালের ভারতবিখ্যাত অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে কলকাতায় তাঁর মাতামহের কাছে থাকার সময়। এরপরে কলেজ জীবনে ঢাকায় হিন্দুস্তানি রাগসঙ্গীতে তিনি তালিম পান ঢাকাপ্রবাসী আগ্রা ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ গুলমহম্মদ খাঁ সাহেব এবং পরে কলকাতায় দীর্ঘকাল বিখ্যাত বাঙালি কলাবৎ সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে। তা ছাড়া তিনি কলকাতায় বিভিন্ন সঙ্গীতসম্মেলনেও বহু বিশিষ্ট ও ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। বিশেষভাবে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি এবং শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকর—এই দুই শিল্পীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে ঘটেছিল। শ্রীবসু যখন সাহিত্যজগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন, সে সময়ে তিনি সঙ্গীত-সাংবাদিকরূপে ভারতবিখ্যাত বহু সঙ্গীতশিল্পী, যথা ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, তিমিরবরন, তারাপদ চক্রবর্তী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আলি আকবর, পান্নালাল ঘোষ, রবিশঙ্কর প্রমুখের চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎকার বিভিন্ন কাগজে—প্রধানত "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশ করেছিলেন এবং তা সঙ্গীতরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

"ওস্তাদকাহিনী" গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীত-জীবনের যে স্মৃতিচারণ করেছেন সেই স্মৃতিচারণে অন্তরভুক্ত হয়েছেন আলাউদ্দিন খাঁ, আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, শ্রীমতী কেসরবাঈ, হীরাবাঈ বরোদেকর, আলি আকবর, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন, তারাপদ চক্রবর্তী, রবিশঙ্কর প্রমুখ বিশিষ্ট গুণিজন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়—গায়ক বৈজু বাওরা, তানসেন, গোপাল নায়ক প্রমুখ অতীতদিনের সঙ্গীত-গুণীদেরও চিত্তাকর্ষক কাহিনী এই স্মৃতিচারণে তিনি পরিবেশন করেছেন।

খলিফা বদল খাঁ-র রোমাঞ্চকর জীবন-ইতিহাস এই গ্রন্থের একটি বিশেষ আকর্ষণ।

সাহিত্যিক হিসেবে শ্রীবসু শিল্পের পিছনে যে শিল্পী মানুষটি লুকিয়ে থাকেন এখানে তারই সন্ধান করেছেন, বিশেষ করে তাঁর ওস্তাদ গুলমহম্মদ খাঁ এবং বড়ে গুলাম আলি খাঁ ও তাঁর অপর দুজন সঙ্গীতগুরু কৃষ্ণচন্দ্র দে ও তারাপদ চক্রবর্তীর—এঁদের চরিত্রগুলি অতি সুন্দর ও মর্মস্পর্শী রূপে তাঁর সশ্রদ্ধ রচনায় ফুটে উঠেছে যার মানবিক আবেদন অতি গভীর। বাঙলার সঙ্গীতসাহিত্যে নিঃসন্দেহে এটি একটি অসাধারণ সংযোজন।

অ. কৃ. ব. তাঁর প্রথম সঙ্গীতগুরু অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র জীবনের ট্রাজেডি (দৃষ্টিলোপ) এবং সেই ট্রাজেডির আঘাতকে কৃষ্ণচন্দ্র কিভাবে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তার মর্মন্তুদ কাহিনী অত্যন্ত গভীর মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙলার গৌরব এই অতুলনীয় সঙ্গীতশিল্পীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশিত না হওয়া আমাদের বাঙালি জাতির পক্ষে লজ্জারই কারণ। সেই লজ্জা কিছুটা দূর করেছেন অ. কৃ. ব. তাঁর বাল্যকালের সঙ্গীতগুরুর এই সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করে। আশা করি, এই অমর সঙ্গীতসাধকের পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী একদিন নিশ্চয় প্রকাশিত হবে এবং সেক্ষেত্রে বলা যায় অ. কৃ. ব এই গ্রন্থে তার গোড়াপত্তন করে রাখলেন।

অ. কৃ. ব.-র দ্বিতীয় সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ গুলমহম্মদ খাঁ-র অনবদ্য চরিত্রচিত্রটি এই গ্রন্থে পড়ে এই বৈরাগী চরিত্রের সঙ্গীতসাধকের প্রতি মন শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে। ঢাকা শহরের সঙ্গীতপ্রেমী সমাজের সভক্তি ভালোবাসা এবং শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা নদী তাঁকে এমন গভীরভাবে আবদ্ধ করে-ছিল যে, কলকাতায় ফিরে এসে বৃহত্তর খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও আর্থিক পসারের মোহ অনায়াসে ত্যাগ করে তিনি সঙ্গীতসাধনায় এবং সঙ্গীতশিক্ষাদানে বাকি জীবন ঢাকাতেই অতিবাহিত করেছিলেন।

ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেবের গানের পিছনে মানুষ বড়ে গুলামের যে চমৎকার চিত্রটি অ. কৃ ব. এঁকেছেন খাঁ সাহেবের সঙ্গে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতার সদ্ব্যবহার করে, তা বাংলার সঙ্গীত-সাহিত্যে এক পরম সম্পদ হয়ে থাকবে। জানা যায় শ্রীবসু তাঁর কাছে একটি বাণী প্রার্থনা করেছিলেন এবং খাঁ সাহেব যে বাণী দিয়েছিলেন তা হল 'সুরমে খুদা হ্যায়', অর্থাৎ কিনা সঙ্গীতে ঈশ্বর আছেন। অ. কৃ. ব. তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনার কণ্ঠ অসাধারণ; ঈশ্বরদত্ত।' এর প্রত্যুত্তরে গুলাম আলি বলেছিলেন, 'সব কিছুই তো ঈশ্বরদত্ত। তিনি যা দিয়েছেন, তা ফিরিয়েও নিতে পারেন।' কথাটা মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়েছিল তাঁর জীবনে। হায়দরাবাদে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়ে ওস্তাদ বড়ে গুলাম তাঁর কণ্ঠস্বর হারান। রেকর্ডে তাঁর গান যখন বাজিয়ে শোনানো হয় তখন তাঁর দু চোখে নেমে আসে জলের ধারা। তিনি

ওস্তাদকাহিনী—অজিতকৃষ্ণ বসু। অসীমা প্রকাশনী, ১৮ তারামণি ঘাট রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৪১। তিরিশ টাকা।

তাসের বিচিত্র ম্যাজিক ও বিচিত্র কাহিনী—অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.-)। অসীমা প্রকাশনী। ১৮ তারামণি ঘাট রোড, কলিকাতা-৪১। পঞ্চান্ন টাকা।

ভাঙা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করে বলেন, "হায় খুদা, কী জিনিস তুমি আমার কণ্ঠ থেকে হরণ করে নিয়েছ।' সুরের জাদুকর সুরহারানো কণ্ঠের বেদনা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ঠিক এর বিপরীতে অ. কৃ. ব. আমাদের শুনিয়েছেন সঙ্গীত-সাধক আবদুল করিম খাঁ-র এক মর্মন্তুদ কাহিনী—খাঁ সাহেব যখন শ্রীঅরবিন্দকে গান শোনাতে পণ্ডিচেরি অভিমুখে ট্রেনে যাত্রা করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মাঝপথে একটি স্টেশনে নেমে পড়তে বাধ্য হন, তিনি বলেন, 'ওঅখৎ আগিয়া।' অর্থাৎ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তাঁর তানপুরা মেলানো হয়—এবং তিনি গানে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে-করতেই দেহ ছেড়ে চিরতরে বিদায় নেন।

আলোচ্য গ্রন্থে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-র অসাধারণ কবিকল্পনার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়েছেন অ. কৃ. ব। তিনি শুনিয়েছেন—শ্রীমতী কেসরবাঈ-এর কমনীয় বামাকণ্ঠে দ্রুতহ তানবৈচিত্র্যে মুগ্ধ ফৈয়াজ খাঁর সপ্রশংস সেই উক্তি: 'ইনকে গানা শুনেমে মুঝে অ্যায়সা লাগা কি ইম্‌লিকে পত্তী পর হাথী নাচ রহা থা।' কবিত্বপূর্ণ এই উপমা থেকে খাঁ সাহেবের উপস্থিত-কবিত্বের একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং জ্ঞান-প্রসাদ গোস্বামীর কাছে অ. কৃ. ব তালিম না পেলেও তিনি এঁদের সঙ্গীতের ছিলেন অত্যন্ত ভক্ত এবং এই দুই অমর বাঙালি সঙ্গীতশিল্পীর ও বাঙলার সঙ্গীত-জগতের ক্ষণজন্মা পুরুষ তারাপদ চক্রবর্তীর যে অসাধারণ চরিত্রচিত্রণ তিনি এই গ্রন্থে করেছেন তার জন্য বাঙলার সঙ্গীতপ্রেমী ও সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে অ. কৃ. ব ধন্যবাদভাজক।

ভারতের সর্বপ্রথম জাদু-সাহিত্যগ্রন্থ 'যাদু-কাহিনী'-র পর শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু আমাদের উপহার দিলেন জাদু-সাহিত্যের আর-একটি ক্লাসিক গ্রন্থ : 'তাসের বিচিত্র ম্যাজিক ও বিচিত্র কাহিনী'।

তাঁর 'যাদুকাহিনী' গ্রন্থটি ছিল মূলত কাহিনী-প্রধান এবং তাতে কাহিনীরই প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক-ভাবে এসে পড়েছিল কিছু-কিছু জাদু-কৌশলের ব্যাখ্যা, যা ছিল জাদু-শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটি প্রধানত পঁয়ষট্টিটি (৬৫) তাসের জাদুর কৌশল ও প্রদর্শন-শৈলী বিস্তারিত ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ একটি এমন গ্রন্থ, যাতে লেখক প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্ত কৌশলগুলিকে অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় চিত্রসহ এবং প্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকজন বিশিষ্ট জাদুকরদের কিছু কাহিনীও তিনি শুনিয়েছেন যা নবীন শিক্ষার্থীদের কাছে চিত্তাকর্ষক এবং লাভজনক।

শ্রীবসু বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যসাধনার সাথে-সাথে নিবিড়ভাবে সঙ্গীত ও জাদুশিল্প চর্চা করে এসেছেন, এবং সেই চর্চাকে সাহিত্যের সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েছেন। দুই বিষয়েই তাঁর নিবিড় চর্চা ও অভিজ্ঞতা প্রায় ছয় দশকেরও অধিককালে বিস্তৃত, ফলে তাঁর জাদু ও সঙ্গীত সম্পর্কিত প্রামাণ্য রচনা-গুলি এক হিসেবে তাঁর সাহিত্যসাধনারই অঙ্গীভূত।

আলোচ্য বইটিতে তাই তাঁর অসামান্য সাহিত্যিক এবং জাদু-বিশেষজ্ঞ রূপ, দুয়েরই ঘটেছে অপরূপ সমন্বয়। একাধারে প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিক এবং প্রথম সারির জাদু-বিশেষজ্ঞ তিনি ছাড়া ভারতে আর কেউ নেই এবং বিদেশেও কেউ আছেন বলে শোনা যায় নি। অবশ্য এই প্রসঙ্গে নোবেল-লরিয়েট কবি-নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক টি. এস. এলিয়টের কথা স্মরণে আসে। তিনি ছিলেন লনডনের বিখ্যাত গ্রন্থ-প্রকাশ-সংস্থা Faber & Faber-এর উপদেষ্টা ডিরেক্টর। তাঁর আমলে এই প্রতিষ্ঠান থেকে জাদু (modern magic) বিষয়ক অনেকগুলি অতি মূল্যবান প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, যা থেকে মনে হয় অসাধারণ সাহিত্যিক টি. এস. এলিয়ট-ও অ. কৃ. ব-র মতো একজন জাদুপ্রেমিক ছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি বাঙলায় লেখা হলেও গ্রন্থের

প্রথমদিকে জাদু সম্পর্কে 'অ. কৃ. ব'-সম্পাদিত Indian Journal of Magic থেকে তাঁর কিছু জাদু সম্পর্কিত মূল্যবান ইংরেজি রচনার অংশও উদ্‌ধৃত করা হয়েছে, এবং গ্রন্থকারপরিচিতিতে প্রকাশিকা গ্রন্থকারের বিচিত্র জীবন সম্বন্ধে যে বিবরণী ও তাঁর জাদু, বিজ্ঞাপন, সাহিত্য এবং সঙ্গীত-জগতে অবাধ এবং নিবিড় বিচরণের যে বর্ণনা গ্রন্থপঞ্জীতে দিয়েছেন, তা যেমন মূল্যবান তেমনি চিত্তাকর্ষক।

যে খেলাগুলির কৌশল অ. কৃ. ব শিক্ষার্থীদের এখানে শিখিয়েছেন, সেগুলি প্রত্যেকটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর খেলা অথচ অল্প অভ্যাসেই একজন সাধারণ বুদ্ধিমান পাঠক বা পাঠিকা সেগুলি শিখে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিতে পারে। এমন কোনো খেলা তিনি এই বইয়ের জন্য বাছেন নি যা কঠিন বা বেশি রকম অভ্যাসসাপেক্ষ। তাসের ম্যাজিক শিক্ষার্থী জাদু শৌখিনদের (hobbyists) পক্ষে এটি একটি অমূল্য সহায়ক গ্রন্থ।

গ্রন্থের শেষে একটি অধ্যায় তিনি তাসের জন্মকথা এবং তাস কিভাবে জিপ্‌সি ও অন্যান্য ভাগ্য-গণনা-কারীদের এবং প্রতারক জুয়াড়িদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে তারপর জাদুকরদের জাদু-প্রদর্শনের অন্যতম প্রধান উপকরণ হয়ে উঠল তার মনোরম ইতিহাস পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিয়েছেন।

বইটির একটি অসাধারণ মূল্যবান আকর্ষণ জাদু-সম্রাট পি. সি. সরকার স্মরণে শীর্ষক অধ্যায়টি। এই অধ্যায়ে পি. সি. সরকারের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় এবং তাঁর 'শেষ দেখা'-র কাহিনীর যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয়। ১৯৩৭ সালে পি. সি. সরকারের লেখা একটি মর্মস্পর্শী চিঠি এই অধ্যায়ে অ. কৃ. ব আমাদের উপহার দিয়েছেন, যা থেকে জাদুকরের জীবনের একটি গভীর বেদনাময় অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং তাঁর অসাধারণ কবিমনেরও পরিচয় এ থেকে পাওয়া যায়। জাদু-সম্রাটের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় আগ্রহী জনের কাছে এই চিঠিখানি বিশেষ মূল্যবান।

স্কুলজীবন থেকে শুরু করে অ. কৃ. ব-র নিবিড়-ভাবে জাদুচর্চার ফলে বাঙলার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছিল। ১৯৩২ সালে কলেজের ছাত্র থাকার সময় লনডনের বিখ্যাত জাদুপত্রিকা 'The Magician Monthly' নামক মাসিকপত্রে তাঁর নব-উদ্‌ভাবিত একটি মৌলিক জাদুকৌশল ব্যাখ্যা করে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বিদেশী জাদু-মহলেরও স্বীকৃতি লাভ করেন এবং সেই রচনা সম্পর্কে ১৯৮৫ সালে ইংল্যানডের বিখ্যাত জাদুপত্রিকা New Pantagram-এর প্রধান সম্পাদক বিখ্যাত জাদুবিশারদ ও ঐতিহাসিক Peterlock তাঁর সম্পাদকীয় বিভাগে লিখেছেন : বর্তমানে 'চপ কাপ' নামে যে খেলাটি জাদুজগতে শিহরন জাগিয়েছে সেটির মূল উৎস ১৯৩২ সালের নভেমবর সংখ্যা Magician Monthly-তে অ. কৃ. ব-র চুম্বকশক্তির গোপন প্রয়োগের কৌশল ব্যাখ্যা করা নিবন্ধটি।

তাঁর এই গ্রন্থে পাঁচটি বিশেষ অধ্যায়ে লিখিত হয়েছে জাদুসম্রাট পি. সি. সরকার, রাজা বোস, রয় দি মিষ্টিক (যতীন্দ্রনাথ রায়), বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী ও যতীন সাহা—এই পাঁচজন প্রখ্যাত জাদুকর সম্বন্ধে। এঁদের প্রত্যেকের প্রদর্শিত কয়েকটি বিশেষ খেলার কৌশল এবং প্রদর্শনভঙ্গি শেখানো হয়েছে এবং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে যা জাদুশিক্ষার্থী ও জাদুপ্রেমিকদের কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান।

আমি এই গ্রন্থটির অসাধারণ মূল্য বুঝতে পারি এই কারণে যে, ১৯৬৯ সালে আমি যখন লনডনে ছিলাম তখন একটি জাদুপ্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এসে জাদুবিদ্যার (modern magic) প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং ম্যাজিককে শখ বা 'হবি' (hobby) হিসাবে গ্রহণ করে এবং কিছুদিন চর্চা করে অনুভব করেছিলাম 'হবি' হিসাবে ম্যাজিকের জুড়ি

নেই। জাদুচর্চার ফলে জাদু-বিষয়ক অনেক ইংরাজি গ্রন্থও আমাকে পড়তে হয়েছিল; আমার সেই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি অ. কৃ. ব.-র এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতের, যা ইংরাজি জাদুসাহিত্যেও দুর্লভ।

বস্তুত, একটি জাদু-কৌশল ব্যাখ্যার গ্রন্থ যে এমন সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ হতে পারে তা এই বইটি পড়ার আগে আমার কল্পনারও বাইরে ছিল।

জাদুপ্রদর্শনের সঙ্গে সাহিত্যকে কিভাবে গেঁথে দিয়ে জাদুকে আরো রসালো এবং সুধীজনের কাছে আরো মনোরম করে তোলা যায় এই গ্রন্থে কয়েকটি খেলায় অ. কৃ. ব. তাঁর নানা উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন একুশ তাসের একটি খেলার সঙ্গে তিনি অমর কবি সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল গ্রন্থের "একুশে আইন" কবিতাটির অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়েছেন এবং চল্লিশ তাসের একটি খেলার সঙ্গে চমৎকারভাবে জুড়ে দিয়েছেন আরব্য উপন্যাসের আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের কাহিনী।

এই গ্রন্থ অ. কৃ. ব.-র পরিণত বয়সের (তাঁর মতে দ্বিতীয় শৈশবের) রচনা। প্রকাশিকার বিশেষ তাগিদে ৭৭ বছরের শেষ দিকে বইটির রচনা শুরু করে তিনি ৭৮ বছরের প্রথম দিকে বইটির রচনা শেষ করেন। সুতরাং এই বইটির রচনার পিছনে রয়েছে তাঁর ছয় দশকের জাদু-চর্চা এবং শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের অন্তরঙ্গ সাহচর্যের অভিজ্ঞতা।

ভ্রমসংশোধন

মার্চ ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত "নারী" কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম লাইনের সঠিক পাঠ হবে—
শৃগাল-কোরাস কিংবা দরবারি কানাড়া

প্রতিবেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

উত্তরপ্রদেশের লোকনাট্য নওটাঙ্কি

কিরণশঙ্কর মৈত্র

পানজাবের সেই রাজকুমারীর নাম ছিল নওটাঙ্কি। তার রূপের খ্যাতি সে যুগে ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে। ফুল সিং নামে তরুণ পঞ্চনদবাসিনী সেই রূপসী রাজকন্যাকে বিবাহ করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। ফুল সিং-এর ভ্রাতৃ-জায়া তাকে পরিহাস করত যে—রাজদুহিতাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করার মতো হিম্মত তার নেই। ফুল সিং এই কথায় অপমানিত হয়ে সেই রাজকন্যাকে বিবাহ করার জন্যে প্রতিজ্ঞা করে। মালীর সাহায্যে সে রাজবাগিচায় গিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে নিজ অভিলাষ জানায়। ক্রমে রাজকন্যার প্রণয়লাভে সফল হয়ে তাকে বিবাহ ক'রে আপন গৃহে নিয়ে আসে।

—এটি উত্তর ভারতের লোকনাট্যের একটি জনপ্রিয় কাহিনী। সেই রাজকুমারীর নাম থেকেই "নওটাঙ্কি" শব্দটি প্রচলিত।

অনেকের মতে, নওটাঙ্কির উদ্ভব পানজাব প্রদেশ থেকে। কিন্তু এর মধ্যে কোনো পানজাবি শব্দ পাওয়া যায় না, যায় হিন্দুস্তানি। বস্তুত, নওটাঙ্কির প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অতীতের দিন থেকে উত্তর ভারতের গ্রাম-জনপদের মানুষের রুচি অনুযায়ী কালস্রোতে পরিবর্তিত হয়ে প্রবাহিত নওটাঙ্কি-লোকনাট্যের ধারা।

মহারাষ্ট্রে যেমন তামাসা, হিমাচলে কারিয়ালা, বাঙলা আর উড়িষ্যায় যাত্রা—উত্তর প্রদেশ ও হিন্দি-ভাষী অঞ্চলে তেমনি নওটাঙ্কি। কানপুর আর হাথরসে নওটাঙ্কির দুটি ধারা বিকশিত। নাটকীয় সংলাপ আর অঙ্গভঙ্গির দিকে কানপুরি নওটাঙ্কিতে বেশি জোর দেওয়া হয়, অন্যপক্ষে হাথরসি নওটাঙ্কিতে রয়েছে নাটকীয়তার সঙ্গে সঙ্গীতময়তার ঝোঁক। অনেকের মতে, হাথরসের নওটাঙ্কি তাই তুলনায় অধিকতর শিল্পগুণসমৃদ্ধ।

নওটাঙ্কির একরূপকে 'ভগৎ'-ও বলা হয়। কিন্তু এ দুটির মধ্যে ঈষৎ পার্থক্য রয়েছে। নাম থেকেই বোঝা যায়—ভগতের মধ্যে রয়েছে ধার্মিক আবহ। আখড়ার গুরুর নির্দেশে আবাসিক শিষ্যরা ভগতের অনুষ্ঠান করেন। গণেশবন্দনা দিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। নওটাঙ্কিতে "বন্দনা" একটি আনুষ্ঠানিক প্রথামাত্র। ভগতের অনুষ্ঠান ভক্তপ্রাণ ব্যক্তিদের বদান্য দানের উপরে নির্ভরশীল, অন্যদিকে নওটাঙ্কি সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়ভিত্তিক, বেতনভোগী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়োগ করা হয় নওটাঙ্কি-অভিনয়ের জন্যে।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহের পরে তৎকালীন সরকার ভগতের মাধ্যমে জনরুচি কলুষিত করার প্রয়াস করলেন ভগত-লেখক আখড়ার গুরুদের দ্বারা সস্তা, অশ্লীল, স্থূলরুচির নাটক লিখিয়ে নিয়ে। এইসব কুরুচিকর নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে জনমানসকে বিপ্লবী ও দেশাত্মবোধক ভাব থেকে বিচ্যুত করবার ইচ্ছে ছিল সে-সময়কার শাসকগোষ্ঠীর। মথুরার জনৈক ভগবতী প্রসাদকে, জনশ্রুতি অনুযায়ী, দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল দুটি অশ্লীল নাটক লিখবার জন্যে। অন্যান্য ভগৎ-আখড়ার গুরুরাও এই ধরনের নাটক লিখতে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত 'ভগৎ'-এর মধ্যে শুধু নামের ভিতরেই ধর্মভাব অবশিষ্ট থেকে যায়। অনেকের মতে, এই 'ভগৎ'ই কালক্রমে বর্তমান 'নওটাঙ্কি'র

রূপ পেয়েছে। মথুরা ও আগ্রার ভগবৎ-আখড়ার নওটাঙ্কির মতোই নাট্যানুষ্ঠান করা হয়। তবে তার মধ্যে আবাসিক ও অব্যবসার প্রকৃতিটি অব্যাহত আছে।

গ্রাম-গঞ্জ-শহরতলিতে নওটাঙ্কির অভিনয় হয়ে থাকে। ক্ল্যাসিকাল বা পুরোপুরি লোকসঙ্গীত এর মধ্যে ব্যবহৃত হয় না। অনেকটা মিশ্র লঘু বা চটুল গীতই নওটাঙ্কিতে গেয়। প্রধান বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে নাকাড়া (একদিকে চামড়ায় ছাওয়া ঢাক)—যা নওটাঙ্কি-অনুষ্ঠানের সূচনা ঘোষণা করে, সেইসঙ্গে সারঙ্গী, হারমোনিয়াম আর ঢোলক।

প্রথমে গাওয়া হয় 'দোহা'—কোনো বাদ্যযন্ত্র ছাড়া, এর পরে 'চৌবোলা', চার লাইনের গান—যা সংলাপ হিসেবে ব্যবহৃত। এর উত্তর দেওয়া হয় 'বাহর-এ-তাবিল'-এ, দু লাইনের সংলাপ-গানে। এর সঙ্গে মিল রয়েছে মারাঠি লোকনাট্য "তামাসা"র 'সওয়াল-জবাবে'র। শেষে দৌড় বা চলতি বা উড়ান—নামের মধ্যেই গীতের দ্রুতগতি সূচিত। শেষের দিকে অবশ্য এটি আবার স্তিমিত হয়ে আসে। তবে নওটাঙ্কির নিজ-নিজ প্রতিষ্ঠান-বৈশিষ্ট্যে ও গায়ক-গায়িকার গায়ন-ভঙ্গীতে বিভিন্নতা আসতে পারে। অনেকে আবার উপরোক্ত তিনটি অংশের মধ্যে অভিনবত্ব সংযোজনের প্রয়াস পান বৈচিত্র্য আনবার জন্যে। এ ছাড়া অন্যান্য যে সঙ্গীত-বিচিত্রা যুক্ত হয় তার মধ্যে রয়েছে 'সৌরাথা', 'আলহা', 'লাবানি', ঝুলা, দাদরা, গজল, কাওয়ালি, এবং অধুনা—চলতি ফিল্মের সুর। লাবানি ও ঝুলা-গায়িকাদের নিজস্ব আখড়া রয়েছে উত্তর প্রদেশের খুরজায়।

শিল্পীদের খ্যাতি নির্ভর করে তার কণ্ঠস্বরের বিস্তৃতি, গেয় সঙ্গীতের ভাব-মাধুর্য ও প্রকাশভঙ্গীর উপরে। ভাষা প্রধানত হিন্দুস্তানি, সেই সঙ্গে স্থানীয় কথ্য ভাষার শব্দাবলীর সুষ্ঠু প্রয়োগে তা আরও গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। ব্রজ-অঞ্চলের নওটাঙ্কি পদ্য-ছন্দোময়, অন্য পক্ষে কানপুরের নওটাঙ্কিতে রয়েছে উর্দু কবিতার সঙ্গে গদ্যসংলাপ। সংস্কৃত নাটকের আংশিক প্রভাব কাহিনী গ্রন্থনায়। সূত্রধার এসে কাহিনীবর্ণনায় সাহায্য করে কখনও-কখনও। অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলে মাঝে-মাঝে নাচ-গান-কৌতুক-হাসির সংযোজন। কানপুরি নওটাঙ্কিতে পার্শি থিয়েটারের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

নাট্যকারদের কল্পনা কোনো বিশেষ কালসীমা বা নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতার মৃত্তিকা থেকে তা উধাও হয়ে যায় অবাস্তবতার কল্পরাজ্যে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও রচনার মধ্যে এমন ইঙ্গিতময়তা থাকে যা দর্শকের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে এবং তারা তার মধ্যে একটি সাযুজ্য সৃষ্টি করে নেয়। সেই সঙ্গে সংলাপের মধ্যে ঝলকিত সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিবিম্ব, বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। সঙ্গীত অবশ্যই একটি মনোরম দ্যোতনা যুক্ত করে। নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হয় অর্কেস্ট্রা-বাদ্যভাণ্ড সহযোগে যার মধ্যে থাকে অর্গান, হারমোনিয়াম, ব্যানজো, নাকাড়া, ঢোলক। এই সঙ্গে রয়েছে গজল, দাদরা, রসিয়া, ভোজপুরী, লোকসঙ্গীত, ফিল্মের গান, এমনকী অধুনা কালের ক্যাবারে নৃত্য—যা অনুষ্ঠানকে কখনও-কখনও আকর্ষণীয় করলেও আবার কুরুচিপূর্ণ করে দেয়।

বলা বাহুল্য, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে নওটাঙ্কিতে অনিবার্য পরিবর্তন এসেছে। পার্শি থিয়েটারের প্রতিবিম্ব থেকে ফিল্মের প্রভাব পড়েছে তার উপরে। তবে লোক-রুচির উপভোগ্যতা প্রবল-ভাবে জাজ্বল্যমান।

পুরুষানুক্রমে যাঁরা নওটাঙ্কিতে অভিনয় করে আসছেন—তাঁরাই এই লোকনাট্যের শিল্পী। দলে কোনো শিল্পীকে সারা বছরের জন্যে নিয়োগ না-করে যখন দরকার তখনই ভাড়া করা হয়। চল্লিশজন শিল্পী-সদস্যসহ কোনো দলের দৈনিক ব্যয় তিন হাজার টাকার মতো। মেলা ও উৎসবের সময়ে দীর্ঘকাল ধরে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে অনুষ্ঠান চলতে থাকে।

এর ফলে যেমন তাদের পারিবারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি ব্যাঘাত ঘটে সন্তানদের পড়াশুনায়।

উত্তর প্রদেশে তিন শতাধিক নওটাঙ্কির দল রয়েছে। পাঁচ সহস্রাধিক নারী-পুরুষ এর সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে হাজারের বেশি নারী। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দলটির কথা বলতে গেলে অবশ্যম্ভাবী ভাবে উল্লেখ করতে হয় কানপুরের গুলাব বাঈয়ের দলটির নাম। মাত্র এগারো বছর বয়সে গুলাব বাঈ নাচগানের মধ্য দিয়ে নওটাঙ্কির দলে তাঁর জীবন শুরু করেন, তারপর নানা অভিজ্ঞতা ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে স্থাপন করেন 'গুলাব থিয়েটার কোম্পানি' এবং নওটাঙ্কিই হয়ে ওঠে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। লোক-নাট্য-শিল্পী হিসাবে তিনি বহু সম্মান লাভ করেছেন, পেয়েছেন ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী'।

বিগত অর্ধশতাব্দীতে পরম্পরাগত অশীল, অমার্জিত নওটাঙ্কির মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে আঙ্গিক আর উপস্থাপনায়। এর মূলে রয়েছে সিনেমা জগতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দ্বিতীয়ত, প্রখ্যাত লেখক, অভিনয়- সঙ্গীত-শিল্পীদের এই লোকনাট্যে যোগদান। এই প্রসঙ্গে বাঙলার যাত্রার কথা স্মর্তব্য।

প্রখ্যাত মারাঠি নাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকার 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' নাটকে নওটাঙ্কির আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন, করেছেন 'নর্দার্ন ইণ্ডিয়া থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে' পুরস্কৃত উর্মিলকুমার থাপলিয়াল'ও 'হরিশচন্দ্র কি লড়াই' নাটকে। নওটাঙ্কির বহিরঙ্গে আধুনিক থিয়েটারের সব উন্নত কলাকৌশল তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। উর্মিলকুমার 'নাগরী নওটাঙ্কি'তে সমকালীন জীবনের সমস্যাগুলি, হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর দলের অপেশাদার শিল্পীদের অভিনয়মানও অনেক উন্নত। 'গামন', 'উমরাও জান'-খ্যাত চিত্র-পরিচালক মুজাফফর আলি নওটাঙ্কির স্টাইলে "লায়লা মজনু" পরিচালনা করেছেন। সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব ছিল এইচ. বসন্তের উপরে—যিনি প্রকৃত লোকসঙ্গীত ব্যবহার করেছেন এবং সঙ্গীতে কণ্ঠ দিয়েছেন গুলাব বাঈয়ের কন্যা সুলালিত-সুকণ্ঠী রেখা।

হিন্দি-বলয়ের গ্রাম-জনপদে অদ্যাবধি নওটাঙ্কি-অভিনয় সর্বাধিক জনপ্রিয়। রাত দশটায় শুরু হয়ে সারারাত ধরে চলে এই লোকনাট্যের আসর। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রোম্যান্টিক, সামাজিক—সব ধরনের বিষয়ই বর্তমানের নওটাঙ্কির বিষয়বস্তু। রাজা হরিশ্চন্দ্র থেকে শুরু করে অমর সিং রাঠোর, সুলতানা ডাকু, আনারকলি, পুকার, সম্রাট অশোক, আউরৎ কা প্যার—সবই নওটাঙ্কির আসরে অভিনীত, এমনকী, রঙ্গা-বিল্লা, ফুলন দেবী, দস্যু-সুন্দরীও।

নওটাঙ্কির পরম্পরাগত চারিত্র-বৈশিষ্ট্যে আস্থাশীল গুলাব বাঈ এর মতে আধুনিক আঙ্গিকে নূতন বিষয়-বস্তু-সমন্বিত নওটাঙ্কি যথার্থ লোকনাট্য নওটাঙ্কিই নয়। তিনি এবং তাঁর মতে বিশ্বাসী যাঁরা, তাঁরা ঐতিহ্যসম্মত নওটাঙ্কিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সরকারের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য দাবি করেছেন।

বস্তুত, এই লোকনাট্যের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা-দানের জন্যে ট্রেনিং সেনটার খোলা প্রয়োজন যেখানে নওটাঙ্কির অভিজ্ঞ প্রবীণ শিল্পীরা নতুনদের তালিম দিতে পারবেন। বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত নওটাঙ্কি-শিল্পীদের পেনশন ইত্যাদি আর্থিক সাহায্যের পরিকল্পনা প্রয়োজন। লোকনাট্য নওটাঙ্কি উত্তরপ্রদেশ তথা হিন্দিভাষী গ্রাম-জনপদের সাংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সবারই উচিত এই লোক-কলাকে সার্বিক সহায়তা ও আনুকূল্য প্রদান।

মার্কিন মুলুকের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু কথা

সন্তোষকুমার দে

আমেরিকার জাতীয় কবি ওয়াল্‌ট্ হুইটম্যান (১৮১৯-৯২) তাঁর 'আমেরিকা' নামক কবিতায় লিখেছিলেন—

Centre of equal daughters, equal sons,
All, all alike endear'd, grown, ungrown,
young or old,
Strong, ample, fair, enduring, capable, rich,
Perennial with the Earth, with Freedom,
Law and Love,
A grand, sane, towering, seated Mother,
Chair'd in the adamant of Time.

সংক্ষেপে আমেরিকার এমন সত্য পরিচয় আর কোথাও দেখি নি।

আমেরিকাকে বলা হয় 'The Melting Pot' —যে পাত্রে গলিত হয়ে মিলেমিশে এক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছে ইউরোপের সব দেশের মানুষ, এমন-কী এশিয়ার চীন-জাপানের লোক পর্যন্ত। এখন গোটা আমেরিকায় ভারতীয়ের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, বঙ্গসন্তানও অগুনতি বলা চলে।

তবু কিন্তু পৃথিবীর অপর গোলার্ধে অবস্থিত ওই বিশাল দেশটি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল কম নয়। বিমানভ্রমণে ভৌগোলিক দূরত্ব এখনই দুদিনের মধ্যে এসে গেছে, ভবিষ্যতে হয়তো আরও কাছাকাছি হবে। আমি তিন-তিনবার ওদেশে গিয়ে নিকট আত্মীয়দের অনুরোধে প্রতিবারই কয়েক মাস করে থেকে ওদেশের কিছু-কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান আর বিষয় দেখবার আর জানবার সুযোগ পেয়েছি। তাই কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে নিবেদন করছি।

আমেরিকা বিরাট দেশ, সমৃদ্ধ দেশ, তার সব দর্শনীয় স্থান দেখা সম্ভব হয় নি, সে চেষ্টাও আমি করি নি। তবে সাধারণভাবে যতটুকু দেখেছি তারও গুরুত্ব কম নয়। যেমন সেবার ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি যখন ওদেশে গেলাম, শুনলাম—আমেরিকা স্বাধীনতা লাভের পর যখন প্রথম শাসনতন্ত্র রচনা ক'রে সর্ববাদিসম্মতভাবে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপটেম্বর প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন এবং বারোটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেন, ওই বৎসরের ওই তারিখে সারা দেশে তার দুইশত বৎসর পূর্তি-উৎসব পালিত হবে। ডাকটিকিটেই তার অগ্রিম আগমনী জানা গেল, চোদ্দ সেনট-এর টিকিটে ফিলাডেলফিয়ায় যে পাবলিক হলে ওই সনদটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার ছবি দেখলাম। অন্যান্য টিকিটে আরও নানা স্মারক এসে গেল। "We the people" দিয়ে যে বয়ান শুরু হয়েছিল, নানা পত্রপত্রিকায় তার দর্শনও মিলল, দেখলাম ক্যালেনডারে সনদ স্বাক্ষরের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। মূল সনদখানি জনসাধারণকে দেখাবার ব্যবস্থা হল, দেখলাম—সেটি কিন্তু ছাপা নয়, অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত। তার প্রথমেই লেখা—

We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure democratic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

তারপর খুব সংক্ষেপে মাত্র সাতটি আর্টিক্‌ল্—তাতে লেজিসলেটিভ, এক্‌সিকিউটিভ, জুডিসিয়াল, স্টেট অ্যানড ফেডারেল গভর্নমেনট, মেথড অব অ্যামেনড্‌মেনট, পাবলিক ডেট, সুপ্রিমেসি অব দি কনস্টিটিউশন, ওথ অব অফিস আর র‍্যাটিফিকেশন নিয়ে সিদ্ধান্তগুলি বিবৃত আছে।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের স্বাক্ষরের পর সেদিন উপস্থিত নিম্নোক্ত রাজ্যগুলির জন-প্রতিনিধিরাও স্বাক্ষর করেছিলেন—

ডেলাওয়ার, মেরিল্যানড, ভারজিনিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, নিউ হ্যাম্পসায়ার, ম্যাসাচুসেটস, কনেকটিকাট, নিউ ইয়র্ক, নিউ জারসি এবং পেনসিলভেনিয়া।

তাঁদের স্বাক্ষরের পূর্বের ঘোষণাটুকুও গুরুত্বপূর্ণ—

Done in convention by the unanimous consent of the states present this seventeenth day of September in the year of our Lord one thousand seven hundred and eighty seven and of the Independence of the United States of America, the twelfth, in witness whereof we have hereunto subscribed our names—

আমেরিকার স্বাধীন সংযুক্তরাষ্ট্র গঠনের ও শাসন-পরিচালনার এই সনদখানি সমগ্র জাতির কাছে অতি পবিত্র মূল্যবান দলিল হিসাবে গণ্য হয়। এই সনদ অনুসারে সকলে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করে তাও বিশেষ গৌরবজনক।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন ওদেশে এই শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তখন ওই বছরেই আমেরিকা হতে ভারতগামী প্রথম বাণিজ্যপোতখানি কলকাতায় আসে। কলকাতা তখন প্রধান বন্দর এবং ইংরেজদের ব্যাবসা আর রাজ্যশাসন, উভয়ের প্রধান ঘাঁটি। ইংরেজরা কিন্তু মার্কিন বণিকদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করলে না। বরং তাদের আনা পণ্য যাতে ভারতের বাজারে না চলতে পারে তারই ষড়যন্ত্র করল। তখন সেই বিপন্ন বণিকদের উদ্ধার করেছিলেন রামদুলাল দে নামক একজন বাঙালি ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর দালালদের সহায়তায় জাহাজের সব মাল বিক্রির ব্যবস্থা করলেন, অধিকন্তু ফেরতপথে যাতে মার্কিন বণিকেরা ভারতের মসলা, গন্ধদ্রব্য, রেশমি বস্ত্র ও মসলিন কাপড়, চট, চা, চিনি, নীল আর চুনিপান্নার গহনা প্রভৃতি কিনে নিতে পারে তার জন্য আর্থিক সাহায্যও করলেন।

ফলে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের যে লেনদেন গড়ে উঠল, তাতে রামদুলালই হলেন প্রধান আমদানিকারক। মার্কিন ব্যবসায়ীরা তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে তাঁদের ভারতগামী একখানি জাহাজের নাম রেখেছিলেন "রামদুলাল"। আর প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের বর্ণোজ্জ্বল ৯´×৬´ ফুট আকৃতির বিরাট একখানি তৈলচিত্র তাঁরা রামদুলালকে উপহার দিয়েছিলেন। হাত ঘুরে-ঘুরে সেই চিত্রখানি আমেরিকায় ভার্জিনিয়ার লী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গিয়েছিল। সুখের বিষয়, মার্কিন-ভারত মৈত্রীর সেই অমূল্য স্মারকচিত্রখানি এখন ফিরিয়ে এনে দিল্লীর রুজভেল্ট ভবনে রাখা হয়েছে।

মনে রাখা দরকার, সেদিনের ইংরেজ সরকার ভারতে প্রেরিত প্রথম আমেরিক্যান অ্যামবাসাডার বেনজামিন জয়কেও পাত্তা দেয় নি। বছরখানেক কলকাতায় থেকে নিষ্ফল চেষ্টা করে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

ঘুরতে-ঘুরতে গেটিসবার্গে গিয়ে বুঝতে পারি নি সেখানকার শান্ত এবং অতিসাধারণ নিরুপদ্রব পরিবেশে সওয়া শত বৎসর পূর্বে কী নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল। ১৮৬৩ সালের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে ওখানেই গৃহযুদ্ধে ৫১০০০ সৈনিক হত, আহত বা নিখোঁজ হয়। হাজার-হাজার আহত সৈন্যকে অস্ত্রোপচার করে কারো হাত, কারো পা কেটে বাদ দিয়ে তাদের বাঁচাতে হয়। ওয়াগন-ভরতি কাটা হাত-পা দূরে নিয়ে মাটিতে পুতে ফেলা হয়। মৃত সৈন্যদের কবর দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় ওখানকার যুদ্ধক্ষেত্রের এক অংশে গণসমাধি দেবার ব্যবস্থা। যুদ্ধপরিস্থিতির দরুন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন রাজধানী ছেড়ে ওই সমাধিক্ষেত্র স্থাপন অনুষ্ঠানে আসতে পারবেন না মনে করে উদ্যোক্তারা বাগ্মী কংগ্রেসম্যান ও ম্যাসাচুসেটস্-এর গভর্নর এডওয়ার্ড এভারেটকে

আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি এলেন।

এদিকে চরম ব্যস্ততা আর সময়াভাবের মধ্যেও ওই অনুষ্ঠানে লিঙ্কন আসবেন বলে সংক্ষেপে দু কথা লিখে নিয়ে এলেন। বাড়িতে তাঁর এক ছেলের তখন অসুখ চলছিল। আগে দুটি সন্তান হারিয়ে প্রেসিডেনটপত্নী শোকাহত ছিলেন। তিনি তাই প্রেসিডেনটকে ওয়াশিংটন ছেড়ে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। সব বাধা উপেক্ষা করে লিঙ্কন অনুষ্ঠানে এলেন এবং অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁর ছোট্ট লেখাটুকু পড়লেন। এভারেটকে তিনি বলেও ফেললেন—শ্রোতারা নিশ্চয় এই বক্তব্য শুনে খুশি হতে পারে নি।

কিন্তু ওই ছোট্ট লেখাটুকুর মধ্যে মাত্র দশটি বাক্য থাকলেও এবং তার ২৭১টি শব্দের মধ্যে ২০২টি শব্দই এক সিলেবলের হলেও তার মধ্যে যে গভীরতা আর আন্তরিকতা ছিল তাই তাকে ইংরাজি ভাষার এক অবিস্মরণীয় ভাষণে পরিণত করেছে। সওয়া শত বৎসর পরেও তার তাৎপর্য কমে নি, বরং তার কয়েকটি কথা দেশ-কাল-পাত্র ছাপিয়ে বিশ্বজনের দরবারে স্থায়ী আসন পেয়েছে।

গেটিসবার্গ বক্তৃতাটি এই —

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war testing whether that nation, or any nation as conceived and so dedicated, can long endure.

We have met on a great battlefield of that war.

We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who gave their lives that, that nation might live.

It is altogether fitting and proper that we should do this.

But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrare, we cannot hallow this ground.

The brave men living and dead, who struggled here, have consecrated it far above our poor power to add or detract.

The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here.

It is for us the living rather to the dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced.

It is rather for us to have here dedicated to the great task remaining before us– that from these honoured dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion—that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that the government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

দেশের সব মানুষই সমান সুবিধা লাভের অধিকারী এবং জনগণের সরকার যে জনগণের দ্বারা জনগণের জন্যই পরিচালিত হয়—এ মৌলিক চিন্তাধারা আজ বিশ্ববাসীর মনে প্রবাহিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য মনে পড়ছে। ফ্লোরিডায় ডিজনে ওয়ার্লড দেখতে গিয়ে একটি মঞ্চে ওয়াশিংটন হতে রেগ্যান পর্যন্ত সকল পরলোকগত এবং জীবিত প্রেসিডেনটকে চলাফেরা করতে দেখলাম, কথা বলতে শুনলাম। যান্ত্রিক উপায়ে কমপিউটার-পরিচালিত ওই প্রমাণসাইজের সবাক পুতুলগুলি হুবহু জীবন্ত মানুষের মতোই দেখায়। ওরা সবাই audio animatronics প্রযুক্তিবিদ্যায় আপাত সজীব।

সেবার ১৯৮৭-র আমেরিকায় পৌঁছে দেখি সারা দেশ প্রেসিডেনট রেগ্যানের ইরান-কনট্রা পলিসির বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠেছে। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টি. ভি.—সবকিছুতেই সেই আলোচনা। সি. আই. এ-র প্রধান পরিচালক উইলিয়াম ক্যাসে তো মারাই গেলেন। সামরিক বিভাগের উপদেষ্টা জন পয়েনডেক্স্টার, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউনসিলের অলিভার নর্থ পদত্যাগ করেন। হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেনটের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকারী আর-এক রেগ্যান (প্রেসিডেনটের নামের বানান Reagan, আর তাঁর নামের বানান Regan) প্রেসিডেনটপত্নী ন্যানসির চেষ্টায় অপসারিত হন। রেগ্যানের গদি ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে নিকসনের গদির মতোই টলটলায়মান হয়ে পড়ে। তবে তিনি গদি না হারালেও সম্মান হারান। সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস অবসর নেওয়ায় প্রবীণ বিচারপতি বর্ক-কে রেগ্যান মনোনয়ন দিলে তা নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বর্ক সে পদ পেলেন না। রেগ্যান অন্য একজন প্রবীণ বিচারপতিকে মনোনয়ন দিলে তাও বাতিল হয়ে যায়। অথচ এই রেগ্যান ১৯৮১ সালে যখন প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করে সান্ড্রা ডে ও'কুনারকে সুপ্রীম কোর্টের সর্বপ্রথম মহিলা বিচারক মনোনয়ন করেন, দেশবাসী তা সানন্দে অনুমোদন করেছিল।

রেগ্যান এর থেকেও কঠিন বিপাকে পড়লেন যখন ১৯৮৭ সালের অকটোবর মাসে নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজারে ভয়ানক 'ক্রাস' ঘটে গেল। এক দিনেই লোকসানের পরিমাণ হল নাকি ছয় হাজার বিলিয়ন ডলার। বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আমেরিকায় শেয়ার বাজারে এমন সর্বনাশ আর কখনো ঘটে নি। যেদিন এই ঘটনা ঘটে সেদিন আমি ম্যানহাটানে অর্থনীতিবিদ ড. সুধীর সেনের গৃহে অতিথি ছিলাম। দেখলাম তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে টি. ভি.-র সুমুখে বসে পরিস্থিতি লক্ষ করছেন। অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র সাহায্যে নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজারের ঘটনা সাগরপারে লনডন এবং টোকিও শেয়ার বাজারেও জানাজানি হওয়ায় কী প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ঘটাতে লাগল তাও টি. ভি-তে দেখা গেল। বলতে গেলে সারা দুনিয়া জুড়ে যেন এক ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটে গেল।

সেদিনই সন্ধ্যায় প্রেসিডেনট রেগ্যান টি. ভি. বক্তৃতায় দেশবাসীকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন, বললেন—'শেয়ার বাজারের ক্ষয়ক্ষতি জাতীয় অর্থ-নীতিকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না। ভয়ের কিছু কারণ নেই।' কিন্তু তা যে নেহাত রাজনৈতিক স্তোক-বাক্য, পরদিন কাগজে-কাগজে তা উচ্চারিত হল।

এর কিছুদিনের মধ্যে গর্বাচভের ওয়াশিংটন আগমন পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশা আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত গর্বাচভ ওয়াশিংটনে গিয়ে রেগ্যানের সঙ্গে আণবিক অস্ত্রহ্রাসচুক্তি স্বাক্ষর করায় শুধু রেগ্যানের মুখরক্ষা হয় নি, সারা দেশ বুঝি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে।

তবে আমেরিকা নিজের দেশে যতই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুক, তার ধনতন্ত্র যে তাকে কত স্বার্থপর করে তোলে তার পরিচয়—রেগ্যানের বৈদেশিক নীতিতে একনায়কতন্ত্রী পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা অক্ষুণ্ণ রাখা। বিরোধী পক্ষ যতই চেষ্টা করুন, রেগ্যান তাঁর পলিসি চালিয়েই যাচ্ছেন। এমনকী আণবিক অস্ত্রহ্রাস বা নিয়ন্ত্রণচুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তাঁর তারকাযুদ্ধের (Star wars) প্রস্তুতি এখনও পরিত্যক্ত হয় নি।

আমেরিকায় দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়েছে, বর্ণবিদ্বেষ বেআইনি হয়েছে, এখন সাদা আর কালো ছেলে-মেয়েরা একই স্কুলকলেজে পড়ে। সাদা-কালো বিয়ে হলেও সমাজ তা মেনে নেয়। তবে তেমন বিয়ের সংখ্যা খুবই কম। রেগ্যান মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার-এর মৃত্যুদিবসকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা করেছেন। ওয়াশিংটন শহরে মার্টিনের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুনেছি। এবং উভয় অনুষ্ঠানেই মার্টিনপত্নী

ও পরিবারবর্গকে হোয়াইট হাইসে এনে রেগ্যান অভ্যর্থনা করেছেন। আর এসব করবার জন্য সবাই তাঁকেও অভিনন্দন জানিয়েছে।

বস্তুত আমেরিকান ইনডিয়ানদের অর্থনৈতিক অবস্থার এখন অনেক উন্নতি হয়েছে, তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারও ঘটেছে। কেনেডি স্পেস সেনটারে দেখেছি, কর্তৃপক্ষ মহাকাশ-গবেষণায় যোগ দিতে শুধু নারীপুরুষনির্বিশেষে নয়, সাদাকালোনির্বিশেষে সকল মার্কিন নাগরিককেই সাদরে আহ্বান করেন—অবশ্য তাঁদের শারীরিক স্বাস্থ্য আর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা চাই, যাতে মহাকাশযানে ভ্রমণের ধকল যুঝতে এবং সইতে পারেন। কালো পুরুষ ও নারী মহাকাশবিহারীরা ইতিমধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করেছেন।

শুধু লেখাপড়ায় নয়, খেলাধুলা, নাচগান আর অভিনয়েও কালোরা বরং এগিয়ে আছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে সারা আমেরিকার মধ্যে সর্বাধিক উপার্জন করেছেন বিল কসবি (Bill Cosby) নামে একজন কালো আমেরিকান। তাঁর উপার্জনের পরিমাণ বাৎসরিক ৮৪ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ মাসিক সাত মিলিয়ন ডলার। কসবি একজন প্রখ্যাত অভিনেতা। টি. ভি.-তে কসবির প্রোগ্রাম খুবই জনপ্রিয়। তা ছাড়া তিনি একজন লেখক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সম্মানের অধিকারী—'ডকটরেট ইন এডুকেশন"। আমি ওখানে থাকতে-থাকতেই তাঁর *Fatherhood* নামক একখানি বই বের করলেন Double Day নামক বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা। প্রথম মুদ্রণসংখ্যা নাকি পনেরো লক্ষ। যে বইয়ের দোকানে যাই সেখানেই দেখি *Fatherhood* বিরাট আকারে ডিসপ্লে করা। বিক্রয়ও হচ্ছে গরম পিঠের মতো। লোভে পড়ে এক কপি কিনলাম। দিব্যি ঝরঝরে লেখা। সরস ভাষায় ছেলেপিলে মানুষ করা নিয়ে মন্তব্যে ঠাসা।

এর আগে তাঁর *Time Flies* নামক একখানি বই পড়েছিলাম, তাতে তাঁর রসজ্ঞানের সঙ্গে পেলাম ব্যাপক পড়াশুনার হদিস।

কসবির মতো খ্যাতিমান মানুষ কালোদের সমাজে আরও আছেন। বলা যায় না, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ওদের সমাজের মি. জ্যাকসন হয়তো আমেরিকার প্রেসিডেনট হয়েও বসতে পারেন। তাঁর জনপ্রিয়তা শুধু কালো সমাজেই সীমাবদ্ধ নয় সাদাদের মধ্যেও বেশ ছড়িয়ে গেছে—তা তাঁর সভার ছবি টি. ভি.-তে দেখে বোঝা যায়।

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা খুবই চমৎকার। যারা সরকারি স্কুলকলেজে পড়ে তাদের সবই ফ্রি! স্কুলের বেতন বা আনুষঙ্গিক কোনো খরচ তো লাগেই না, এমনকী স্কুলবাস পর্যন্ত ফ্রি। তার পাশে-পাশেই আছে প্রাইভেট স্কুল। সেখানে সবকিছুর উচ্চহারে খরচ, তবু সেখানেও ছাত্রের কমতি নেই।

বাচ্চাদের স্কুল, বড়োদের স্কুল—সর্বত্র শিক্ষার সঙ্গে খেলাধুলার ব্যবস্থাও আছে দেখেছি। তা ছাড়া, তাদের পাঠ্যবইগুলিও এমন ভাবে লেখা যাতে সহজেই বিষয়টি মনে বসে যায়।

এই প্রসঙ্গে ওদেশের মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরির বিপুল ব্যবস্থাও যে শিক্ষার প্রসারে কত সহায়ক, তা বলা দরকার। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি শিক্ষার সর্ববিষয়ে এদের মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি যেন হাজার দুয়ার খুলে রেখেছে। শুধু ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক আর পণ্ডিত মানুষরাই নয়, জনসাধারণও তাই বহু বিষয় সহজে জানতে পারে, চিনতে পারে, তার ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে।

ওয়াশিংটনের মহাকাশ অভিযানের বিরাট মিউজিয়ামে বিমান আবিষ্কারের প্রথম অবস্থা হতে অতি আধুনিক রকেট শাটল পর্যন্ত চোখে দেখা যায়। চাঁদে যে মডিউল নেমেছিল, যে মহাকাশযান চাঁদ প্রদক্ষিণ করে মানুষের চাঁদে আসা সম্ভব করেছিল,

চাঁদ থেকে যে পাথর আনা হয়েছে—সবই সেখানে আছে। ফ্লোরিডায় কেনেডি স্পেস সেনটারে গেলে আরও বহু বিষয়, বিশেষ করে রকেট উৎক্ষেপণস্থান প্রভৃতি দেখা যায়।

প্রত্নতত্ত্বের মিউজিয়াম বহু শহরে আছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সবচেয়ে বড়ো মিউজিয়াম স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট, প্রায় একটা অঞ্চল জুড়ে বড়ো-বড়ো বাড়িতে সে এক বৃহৎ কর্মকাণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। তা ছাড়া, ক্যালিফোর্নিয়ায় ডিজনেল্যাণ্ড ফ্লোরিডায় ডিজনে ওয়ার্লড আর 'এপকট্ সেনটার'-ও অবশ্য দর্শনীয়। শিশুদের জন্য তৈরি হলেও এগুলি দেখে বয়স্করাও অনেক বিষয় জানতে পারেন।

বিখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসনের নিউ অরেনজ (নিউ জার্সি) এবং ফোর্ট মায়ার্স (ফ্লোরিডার)-এর প্রদর্শনী, ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটরগাড়ির মিউজিয়াম, ভার্জিনিয়ার লুরে ক্যাভার্নের কাছে মোটরগাড়ির মিউজিয়ম প্রভৃতি দেখেছি আর ভেবেছি—শুধু চোখে দেখলেও কত বিষয় শেখা যায়। ছাত্রদের এসব কত বিষয়ে আগ্রহী করতে পারে।

ভারজিনিয়ার লুরে ক্যাভার্নের মতো বৃহৎ আকারে গুহামিউজিয়মও আর কোথাও নেই। পাহাড়ের ফাটল চুঁইয়ে বর্ষার জল নেমে কোটি-কোটি বছরে কী অপূর্ব গলিত চুনাপাথরের বর্ণাঢ্য দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ভূতাত্ত্বিকেরা এদের বলেন stalactite—যা গুহার উপর থেকে ঝুলতে-ঝুলতে জমে শক্ত হয়ে যায়। আর অন্যটি stalagmite—যা উপর থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় পড়ে গুহার মেঝেতে জমে থামের মতো উঁচু হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের পর্বতগুহায় দু রকমের জমাট পাথরই দেখা যায়, কিন্তু তা লুরে ক্যাভার্নের মতো বর্ণময় নয়। লুরে ক্যাভার্নটির ভিতর কয়েক মাইল জুড়ে এই সৌন্দর্যরাজ্য।

শিক্ষার জগতে লাইব্রেরির দান সবচেয়ে বেশি এবং আমার মনে হয় কোনো জাতিকে যদি উন্নত হতে হয় তবে তার লাইব্রেরির সংখ্যা এবং তাদের মান উন্নত করা একান্ত দরকার। সে বিচারে আমেরিকা খুবই উন্নত এবং সত্যই প্রগতিশীল।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো লাইব্রেরি হল ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস। তাজমহলের সৌন্দর্যমণ্ডিত মর্মরহর্ম্যতলে যদি আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরিটি স্থাপন করা যেত তবে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস-এর প্রধান যে বাড়িটি, নাম জেফারসন বিলডিং, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যেত। ওয়াশিংটনে ক্যাপিটল হিল-এর (ক্যাপিটল প্রাসাদের কাছেই) এক পাড়া জুড়ে লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের তিন-তিনটি সুবৃহৎ অট্টালিকা। ইনডিপেনডেনস অ্যাভিনিউ নামক প্রশস্ত রাজপথের উভয় দিকে দাঁড়িয়ে টমাস জেফারসন বিলডিং এবং জেমস ম্যাসিডন মেমোরিয়াল বিলডিং। দুটি বাড়িরই এক পাশ দিয়ে গিয়েছে ফার্স্ট স্ট্রীট, অপর পাশ দিয়ে সেকেনড স্ট্রীট। জেফারসন বিলডিং-এর পিছনে সেকেনড স্ট্রীটের অপর পারে জন অ্যাডামস বিলডিং। তিনটি বাড়ির মধ্যে রাস্তা দিয়ে সুড়ঙ্গপথেও বাড়তি যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে, ফলে উপরে রাস্তায় যানবাহন চলাচল করলেও মাটির নীচে দিয়ে বইভর্তি ছোটো মোটরট্রাকও এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাতায়াত করতে দেখেছি। এর মধ্যে ম্যাডিসন মেমোরিয়াল বিলডিংটি আইনের বইপত্র এবং 'কপিরাইট' বিভাগের যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ে সদাব্যস্ত।

১৮০০ সালে প্রেসিডেনট টমাস জেফারসন কংগ্রেসের ব্যবহারের জন্য একটি লাইব্রেরি স্থাপন করতে ৫০০০ ডলার অনুমোদন করেন, তাই দিয়ে ১১ ট্যাঙ্ক-ভর্তি বই আর এক ট্যাঙ্ক-ভর্তি ম্যাপ ইংল্যানড হতে এনে ক্যাপিটল ভবনের এক অংশে ছোটো আকারে এই লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৪ সালে ইংরাজ সৈন্য ক্যাপিটল অধিকার করে তাদের মার্কিন উপনিবেশ পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট

হয়। সেই সময় ইংরাজরা লাইব্রেরিটি সম্পূর্ণ গুড়িয়ে ফেলে।

যুদ্ধ থামলে, ইংরাজ হটে গেলে, আবার লাইব্রেরিটি গড়ে তোলা হয়। তখন অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট জেফারসন মনটিচেলোতে বাস করতেন। সেখানকার তাঁর বাড়ির সংগ্রহ হতে ৬৪৮খানি বই কংগ্রেসকে মাত্র ২৩,৯৫০ ডলারে দিয়ে দেন। তাই নিয়ে আবার কাজ শুরু হয়। ১৮৯৭ সালে জেফারসন বিলডিং তৈরি ও ৫০ জন স্থপতি, চিত্রকর ও ভাস্করের চেষ্টায় তার সম্পূর্ণ অলঙ্করণ শেষ হয়। তখন দেখা যায় সেটিই হয়েছে একটি শিল্পমণ্ডিত জাদুঘরের মতো এক বৃহৎ লাইব্রেরি-বাড়ি যার মূর্তি, চিত্র, মর্মর পাথরের স্তম্ভ, সিঁড়ি, রেলিং ও অন্যান্য অলঙ্করণ অতি নিপুণভাবে তৈরি। মেঝে থেকে প্রাসাদচূড়ার ডোমটি ১৬০ ফুট উঁচু। আর্ট গ্যালারির মতো চিত্তাকর্ষক তার সাজসজ্জা।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেস-এর রিডিংরুমের সংগ্রহেই আছে ৪৫০০০ রেফারেন্স বই, ক্যাটালগ রুমে ২৩ মিলিয়ন কার্ড। শুধু মেইন রিডিং রুমেই ২১২টি ডেসক। কমপিউটারযন্ত্রের সহায়তায় চটপট যে-কোনো বই খুঁজে বের করার ব্যবস্থা আছে।

সব মিলিয়ে ৮০ মিলিয়নেরও বেশি সংগৃহীত বস্তু আছে যার মধ্যে প্রাচীনতম প্যাপিরাস হতে আধুনিকতম মাইক্রোফর্ম—সবই আছে। যতগুলি তাক নিয়ে এইসব মহামূল্য বইপত্র সাজানো আছে তা পাশাপাশি রাখলে ৫৩২ মাইল লম্বা হবে। ষাটটি ভাষার ২ কোটি বই আছে। পাণ্ডুলিপি, বিখ্যাত ব্যক্তিদের চিঠিপত্র, ম্যাপ, অ্যাটলাসও প্রচুর। ফটো, ফিল্ম, রেকর্ড, ক্যাসেট লক্ষ-লক্ষ। গুটেনবার্গের ছাপা মূল বাইবেল, মেইনজ-এর বিরাট আকৃতির সচিত্র বাইবেল স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত হয়।

নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি আর-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরি যা দেখতেও কনডাকটেড ট্যুর নিতে হয়েছিল। সেখানেও ভাস্কর্য, চিত্র প্রভৃতির সমারোহ আছে। এখানেই "রিডার্স ডাইজেস্ট" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ডি উইলট ওয়ালেস ও তাঁর পত্নী লীলা একমন ওয়ালেস যে ঘরে বসে লাইব্রেরির পত্রিকার সহায়তা নিয়ে তাঁদের কাজ শুরু করেছিলেন সেই অঞ্চলটি তাঁরা লক্ষ-লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে অতি মনোরম মূল্যবান সজ্জায় সাজিয়ে দিয়েছেন। বিখ্যাত প্রকাশক ম্যাকগ্র হিল এই বাড়িটির কেন্দ্রে দোতলার গোল বারান্দাটি চমৎকার দেওয়ালচিত্র দিয়ে সাজিয়ে তাতে ছাপাখানার আদি থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত স্তরে-স্তরে দেখিয়েছেন। ওই গোল বারান্দাটির নামই রাখা হয়েছে ম্যাকগ্র হিল রোটানডা। এই লাইব্রেরির চিত্রশালায় বেশ কিছু প্রাচীন চিত্র আছে, তার মধ্যে অন্ধ মিলটনের "প্যারাডাইস লস্ট" মহাকাব্য রচনার দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়। এই লাইব্রেরিতে বসে গবেষণা করে 'polaroid' instant camera এবং xerox copier যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমেরিকায় এইসব বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরির সঙ্গে রয়েছে সংখ্যাতীত আঞ্চলিক লাইব্রেরি। স্কুলকলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব লাইব্রেরি এবং লাইব্রেরি-সমূহের পারস্পরিক অফুণ্ঠ সংযোগ সহযোগিতা—যার ফলে লাইব্রেরিতে যে বই নেই তারা তা অন্য লাইব্রেরি থেকে এনে দেয়। প্রায় সব লাইব্রেরিতে বই ছাড়াও রেকর্ড, ক্যাসেট, ভি.ডি.ও, ফিল্ম, এমন-কী এসব বাজাবার যন্ত্রও ভাড়া দেয়। সাধারণ লাইব্রেরি ব্যবহার ছাত্ররাও যাতে সহজে করতে পারে তার জন্য অধিকাংশ আঞ্চলিক লাইব্রেরিতে পাঠ্য বই এবং পাঠ্য বিষয়ক সহায়ক বই রাখা হয়। তা ছাড়া সারা বছর ধরে লাইব্রেরিতে নানা রকম অনুষ্ঠান করে গ্রাহকদের আগ্রহ জাগ্রত রাখবার সুব্যবস্থা আছে।

একখানা কেমিস্ট্রি পাঠ্য বইয়ের সন্ধানে ওদেশের প্রাচীন ও বিখ্যাত গ্রন্থবিপণি Barnes and Noble-এর Fifth Avenue-এর একটি বিশাল দোকানে গিয়েছিলাম। সেখানে পেলাম না। সেলস-ম্যান বললেন—অল্প দূরে তাদের পুরাতন বইয়ের

বিভাগে সন্ধান করতে। সেখানে গিয়ে তাজ্জব বনে গেলাম। লক্ষ-লক্ষ পুরাতন, shopsoiled, বাতিল হওয়া বইয়ের সে এক বৃহৎ আয়োজন। ওখানেও না পেয়ে পথে অন্য দোকানেও সন্ধান করব ভেবে ঈস্ট ওয়েস্ট বুকস নামে ৭৮ ফিফ্‌থ অ্যাভেনিউ-এর দোকানে ঢুকে চোখকে যেন আর বিশ্বাস করতে পারিনে। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মবিষয়ক বাঙালি ও অবাঙালি বহু ভারতীয় সাধুসন্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তির অগণ্য বইয়ের বিরল সমাবেশ এবং তার মধ্যে শ্যামাচরণ লাহিড়ীর যোগসাধনার বাঙলা বইও স্থান পেয়েছে। কলকাতায় খ্যাতনামা ইংরেজ তন্ত্রসাধক স্যর জন উডরফের লেখা হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের বিষয়ে অনেকগুলি ইংরাজি বই এখানে পেয়ে গেলাম, যা কলকাতায় সচরাচর পাওয়া যায় না।

ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতির প্রতি ওদেশের মানুষের আগ্রহ কত প্রবল তা আরও বুঝলাম—যখন ব্রুকলীন অ্যাকাডেমি অব মিউজিক তাঁদের 'নেকস্ট্ ওয়েভ ফেস্টিভ্যাল—১৯৮৭' অনুষ্ঠানটির প্রোগ্রাম ঘোষণা করলেন। "মহাভারত" থেকে পাশাখেলা, পাণ্ডবদের বনবাস এবং যুদ্ধ এই তিন অংশ নিয়ে এক তিন-অধ্যায়ী বিপুল নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করা হল। ১৩ অক্টোবর হতে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সেই বিরাট অনুষ্ঠানে দর্শকদের সুবিধার জন্য নাটকের তিনটি সুস্পষ্ট বিভাগ পর পর তিন দিন রাত আটটায়, অথবা প্রতি সপ্তাহে একদিন করে তিন সপ্তাহে, কিংবা যারা একনাগাড়ে বসে অত বড়ো নাটক দেখতে সময় দিতে পারবেন তাদের জন্য একদিনে বেলা একটায় শুরু হয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। একসঙ্গে দেখবার কষ্ট লাঘব করবার জন্য প্রথম আর দ্বিতীয় ভাগের অভিনয়ের মধ্যে বিরতি এবং দ্বিতীয় আর তৃতীয় ভাগের মধ্যে খানাপিনার জন্য একটু বেশি সময়ের বিরতির ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া, 'হলউইন' নামক বাচ্চাদের উৎসবের রাতে যাতে দর্শকদের অসুবিধা না হয় তাই অভিনয় শুরু করবার ব্যবস্থা হয়েছিল সকাল সাতটা থেকে। (পিটার ব্রুকের এই 'মহাভারত'-এর সংক্ষিপ্ত ফিল্ম্ সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিল।)

অগ্রিম টিকিট দেবার ব্যবস্থা ছিল এবং সে টিকিটের জন্য ধরনা দেবার লোকের অভাব হয় নি। টিকিট না পেয়ে ফিরেছেন এমন অনেককে দেখেছি—যদিও মোট পঁচিশ বার পূর্ণ নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল।

এত আগ্রহের কারণ, এই "মহাভারত" মঞ্চস্থ হয়েছিল আমেরিকার ব্রুকলীন অ্যাকাডেমি অব মিউজিক, ফ্রান্সের সেন্টার ইনটারন্যাশনাল থিয়েট্রেলস্ এবং ইংলনডের দি রয়াল শেকসপীয়ার থিয়েটার-এর মিলিত প্রচেষ্টায়। এই 'মহাভারতের অভিনয় লনডনে এমন আলোড়ন এনেছিল যাতে লনডনের Sunday Times পত্রিকা মহাভারত অভিনয়কে বলেছেন—"The Theatrical Event of the Century"। শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকের বিষয়বস্তু যে ভারতীয়, এ ভাবতে কোন্ ভারতীয়ের না গর্ব বোধ হয়?

ভারজিনিয়ায় দিন দশেক থাকবার সুযোগ ঘটায় ওখানকার বিশ্ববিখ্যাত লুরে ক্যাভার্ন দেখবার সাধ মিটেছিল। শহর ছাড়িয়ে গ্রাম, গ্রাম ছাড়িয়ে পথ গিয়েছে পাহাড়ের উপর দিয়ে, অনেকটা যেন দার্জিলিং কার্সিয়াং অঞ্চলের পথের মতো। মাঝে-মাঝে মেঘলা আকাশ যেন নীচু হয়ে পাহাড়ের গাছ-পালা স্পর্শ করছে, ঘন কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে পথঘাট, বুঝি মেঘের পাতলা পরদা ছিঁড়ে চলেছি মোটরে। Skyline Drive দিয়ে গিয়ে আরও কয়েকটি ক্যাভার্ন বা গুহা ছাড়িয়ে একটি প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে বহু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখে বুঝলাম, গন্তব্য স্থলে পৌঁচেছি। লুরে ক্যাভার্ন বিশ্বের বিস্ময়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক আলাদিনের আশ্চর্য জগৎ। তার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার স্থান নেই, শুধু বলতে ইচ্ছা হয়, বিশ্বপ্রকৃতি সত্যই বিচিত্ররূপিণী।

অনেকদিন আগে টি. এস. এলিয়টের লেখা

'Virginia' নামে একটি কবিতা পড়েছিলাম, তাতে কিন্তু কোনো ক্যাভার্নের উল্লেখ দেখি নি। ঘরে ফিরে, পাড়ার লাইব্রেরিতে গিয়ে ইলিয়টের কাব্যে সেই কবিতাটি খুঁজে বের করলাম। কবিতাটি এই—

Virginia

Red river, red river
Slow flow heat is silence
No will still as a river
Still, will heat move
Only through the mocking bird
Heard once? Still hills
Wait, Gales wait, purple trees,
White trees, wait wait,
Delay, decay. Living living
Never moving, Ever moving
Iron thoughts came with me
And go with me.
Red river, river, river.

রক্তিম নদীর তীরে সে কি অন্য আর-এক ভারজিনিয়ার কথা কবি বলেছিলেন? আমেরিকার ভারজিনিয়ার কথা বললে লুরে গুহাতীর্থ নিশ্চয় বাদ পড়ত না।

মতামত

১

সুরাবর্দির নৈতিক সততা এবং যোগ্যতার বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে

জানুয়ারি-ফেবরুয়ারি সংখ্যার "চতুরঙ্গে" আমার সামান্য লেখা অগ্রজ মনীষী শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তার প্রমাণ মার্চ সংখ্যায় পেয়ে আমি বিশেষ কৃতার্থবোধ করছি। তিনি ঠিকই বলেছেন, একটি তথ্যের ভুল আছে। মূল ইংরেজি রচনায় ১৯৪৬-এর মার্চে সাধারণ নির্বাচনের উল্লেখ আছে, কিন্তু অনুবাদে অসাবধানতাবশত সেটি বাদ পড়ে। এটি নিশ্চয় ত্রুটি। তবে সুরাবর্দী যে শ্রীযুক্ত জিন্না ও ইংরেজ—উভয় পক্ষের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন, এবং তার জন্যেই নাজিমুদ্দিন নেমে দাঁড়ান, আমার তদানীন্তন এই ধারণা এখনও বদলাবার কোনো কারণ দেখি না। আমার মনে হয় না আমার লেখায় ট্র্যান্সফার অভ পাওয়ারের বারো খণ্ডের কোনো অংশ সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। আমার আত্মকথা শুরু করার আগেই শ্রীযুক্ত রায়ের নির্দেশমতো শুধু চার খণ্ড নয়, বারো খণ্ডই দেখেছি। তবে আমার নিজের কথায় আমি "স্মৃতি-কথা"য় ব্যাপৃত ছিলুম। যে সময়ের কথা লিখছি যে সময়ে কী কী বেরিয়েছিল, তারই উপর মুখ্যত নির্ভর করে লিখছি! পরে কী প্রকাশ পেয়েছে, তার উপরে বুদ্ধি-বিচার শানিয়ে বেশি বোঝদার হতে চাই নি। ভাষা, বিশেষত লিখিত ভাষা, এবং সরকারি নথিপত্র যে বহুক্ষেত্রে প্রকৃত মনোভাব ও অভিপ্রায় গোপন করার জন্যে ব্যবহৃত হয়, এমনকী বিকৃত করা হয়, শ্রীযুক্ত রায় প্রশাসক হিসাবে তা নিশ্চয় জানেন। ইংরেজরা যে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শ্বেতপত্র এবং ভবিষ্যতে প্রকাশ হবে এই নিশ্চিতজ্ঞানে নথিপত্র সেভাবে সৃষ্টি করতেন, তার প্রমাণ হিসাবে ইতিহাসের ছাত্ররা টটেনহাম শ্বেতপত্র এবং সে-সম্বন্ধে গান্ধীজীর প্রতিবাদগুলি স্মরণ করবেন। ওয়াটারগেট 'টেপ'গুলি না থাকলে নিকসনের ইমপীচমেনট শুধু লিখিত বা মুদ্রিত নথিপত্রের উপর নির্ভর করে সম্ভব হত না। শ্রীযুক্ত রায় লিখেছেন, 'সুরাবর্দির চেয়ে যোগ্যতর মন্ত্রী সাঁইত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ—এই দশ বছরে আমরা দেখি নি।' বিচারবিভাগে এই দশ বছরের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে পর্যবেক্ষণের যে অমূল্য সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, তা অবশ্য আমি ১৯৪১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রশাসনের ভিতরে থেকে পাই নি। তবে সুরাবর্দির যোগ্যতার ফলে সমগ্র দেশবাসী ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে, ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় যে নিদারুণ যন্ত্রণা ও মৃত্যুপথে চালিত হয়—তার কিছুটা ভুক্ত-ভোগী আমি হই। ১৯৪১-৪৭-এর প্রথম তৃতীয়ার্ধে ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ যে যোগ্যতা, দৃঢ়তা, দেশপ্রেম আর নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন তার তুলনায় বরং সুরাবর্দি, হার্বার্ট ও বারোজের মেরুদণ্ড-হীন আজ্ঞাবহ হিসাবেই কাজ করেছেন বলা যায়। আসলে আমার মনে হয়, সুরাবর্দি সাহেব ১৯৪৩-এর মন্বন্তর এবং ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর বুঝতে পারেন তিনি হয়তো নিজের অজ্ঞাতে ইংরেজদের এবং শ্রীযুক্ত জিন্নার হাতের ক্রীড়নক হয়েছিলেন; এবং তারই অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সম্ভবত তিনি দাঙ্গার সময়ে লালবাজারের কনট্রোলরুমে টেবিলে মাথা কুটে আক্ষেপ করেছিলেন: 'আমার বেচারী নির্দোষ মুসলমানরা' এবং পরে গান্ধীজীর বিশেষ অনুরক্ত হন। কিন্তু তখন নিতান্তই দেরি হয়ে গেছে। এমনকী নোয়াখালির দাঙ্গাতেও তিনি গোলাম সারোয়ারকে প্রথম থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন নি, এটিও

নিশ্চয় তাঁর ত্রুটি এবং তাঁর নৈতিক সততা ও 'যোগ্যতা'র বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে আছে।

শ্রীযুক্ত রায়ের বাকি উক্তিগুলির সঙ্গে আমার রচনার কোনো সম্পর্ক না থাকায় আমার আর কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অশোক মিত্র
কলকাতা

২

'লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করি।'

'চতুরঙ্গ' ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় অশোক মিত্রের লেখা পড়ে ইচ্ছে থাকলেও এই নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা আমার মতো সামান্য পাঠকের নেই। তিনি যা লিখেছেন তা যেন আমাকে আবেগে আপ্লুত করেছে।

যেমন : '...বুঝলুম, অজান্তে আমার মুখ দিয়ে মহাস্ত্র বেরিয়ে গেছে, সেই অস্ত্র আমি পরে ভারতের সর্বত্র ব্যবহার করেছি, কোথাও বিফল হই নি, এমনি ভারতীয় আতিথেয়তা। পুরুষরা জিভ কেটে বলল, সাহেব, আমরা যে জাতে ধাঙড়, আমাদের হাতে খাবেন?' 'খাব না তো কী, নিশ্চয় খাব', বলাতে তাঁরা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। মুড়ি, গুড়, জল আনার জন্য সে কী হুড়োহুড়ি। তারপর সকলে মিলে মুড়ি খেয়ে সারা গ্রাম ঘুরে দেখলুম। গেলুম ঘরদোরের ভিতর। সেই আমার ভারতের দারিদ্র্যের আর নিঃস্বতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। অনেক দুঃখ আর কিছু অত্যাচারের কথাও শুনলুম। কিন্তু সেসব পরে অনেক দেখেছি বা শুনেছি। তবে, সকলে মিলে খাওয়াতে তাদের ও মেয়েদের মুখের অপার্থিব তৃপ্তির হাসি আমার চোখে এখনও লেগে আছে।'

'শিক্ষিত উচ্চবর্ণের অথবা মধ্যবিত্ত খুব কম হিন্দু বাঙালিকে আমি শুনেছি মেথর বা মেছুনির সঙ্গে, গলায় কর্কশ বা হুকুমের সুর না এনে, সমানভাবে 'আপনি' সম্বোধন করে কথা বলতে। বাড়িতে এলে বসতে বলার তো কথাই ওঠে না। আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্বিশেষে সকলকে 'আপনি' সম্বোধন করা আমি মুন্সীগঞ্জে বাঙালি মুসলমানদের কাছে শিখেছি।'

এ দুটো প্যারাগ্রাফ পড়ে আমার মনে হয়েছে আমি যেন কাঁদতে বসেছি। মনে হচ্ছিল কেন এমন হয়? লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

শেখ একরামুল হক
গ্রাম+পোঃ—বিজয়গাছক,
মেদিনীপুর, ৭২১১৫২

HADA TEXTILE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office :
4, GOVERNMENT PLACE NORTH, CALCUTTA-700 001
Telephone : 23-3942, 23-1679 Telex : 021-3417

Manufacturers of Quality Tere-Cot, Yearn, Super-Combed Hosiery-Yearn and other Weaving Yearn in Hanks & Cones.

Factory :
DIAMOND HARBOUR ROAD, BISHNUPUR, 24 PARGANAS, WEST BENGAL
Telephone : 615-201